(মক্কার জনৈকা পাগলিনি) মহিলার মত হয়ো না, যে সূতা কাটার পর খণ্ড-বিখণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে, যাতে (তার মত) তোমরা (-ও) কসমসমূহকে (পাকা করার পর ভঙ্গ করে সেগুলোকে) পারস্পরিক কলহের অজুহাত গ্রহণ কর (কেননা কসম ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে মিত্রদের মধ্যে অনাস্থা এবং শত্রুদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এটা অশান্তির মূল। ভঙ্গ করাও শুধু) এ কারণে যে, একদল অন্য দলের চাইতে (সংখ্যাধিক্য অথবা ধনাঢ্যতায়) বেড়ে যায়। (উদাহরণত কাফিরদের দু'দলের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে এবং তাদের একদলের সাথে তোমাদের মৈত্রী স্থাপিত হয়ে যায়। অতঃপর অপর দলকে অধিক ক্ষমতাবান দেখে মিত্রদলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অপর দলের সাথে তোমরা চক্রান্তে লিপ্ত হও। অথবা কেউ অমুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর কাফিরদের অধিক জোর দেখে ইসলামের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। আর এই যে, একদল অন্যদলের চাইতে অধিক ক্ষমতাবান হয় অথবা অন্য কোন দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বেড়ে যায়, তবে) এতদ্বারা (অর্থাৎ বেড়ে যাওয়া দ্বারা) আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন (যে, কে অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং কে অধিক জোর দেখে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে।) আর যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে (এবং বিভিন্ন পথে চলতে) কিয়ামতের দিন তিনি সব (-গুলোর স্বরূপ) তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবেন (ফলে সত্যপন্থীরা পুরস্কার এবং মিথ্যা পন্থীরা শাস্তি পাবে। অতঃপর মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে এ মতবিরোধের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে ---) এবং (যদিও মতবিরোধ হতে না দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ্র ছিল, সেমতে) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে একদল করে দিতে পারতেন, কিন্তু (রহস্যের তাগিদে যা বর্ণনা করা ও নির্দিষ্ট করা এখানে জরুরী নয়---তিনি) যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন (সেমতে পথ প্রদর্শনের অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং বিপথগামিতার অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বিপথগামীরা দুনিয়াতে যেমন পূর্ণ শাস্তি পায় না, তেমনি পরকালেও লাগামহীন থাকবে। তা কখনই নয়; বরং কিয়ামতে) তোমরা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে এবং (অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে যেমন বাহ্যিক ক্ষতি হয় যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তেমনিভাবে এর ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষতিও হয়। অতঃপর তাই উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক অনাসৃষ্টির কারণ করো না। (অর্থাৎ তোমরা অঙ্গীকার ও কসমসমূহ ভঙ্গ করো না)। কখনো (তা দেখে) অন্য কারও পা ফসকে না যায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। (অর্থাৎ অন্যরাও তোমাদের অনুসরণ করবে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে থাকবে) অতঃপর তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে (অপরকে) বাধাদান করার কারণে কষ্ট ভোগ করতে হবে। (কেননা, অঙ্গীকার পালন করা হচ্ছে আল্লাহ্র পথ। অথচ তোমরা তা ভঙ্গ করার কারণ হয়েছো। এটাই হচ্ছে পূর্বোক্ত অভ্যন্তরীণ ক্ষতি; অর্থাৎ অপরকেও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী করেছ।) এবং (কষ্ট এই যে, এমতাবস্থায়) তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। আর শক্তিশালী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যেমন নিষিদ্ধ যা উপরে বর্ণিত হল; তেমনি অর্থকড়ি উপার্জনের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হচ্ছেঃ তোমরা

আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে (দুনিয়ার) কিঞ্চিৎ উপকার গ্রহণ করো না (আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের অর্থ শুরুতে জানা হয়েছে। 'যৎকিঞ্চিৎ উপকার' বলে দুনিয়া বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়া অনেক হওয়া সত্ত্বেও অল্পই। এর স্বরূপ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,) আল্লাহ্‌র কাছে যা (অর্থাৎ পরকালের ভাণ্ডার তা তোমাদের জন্য পার্থিব সামগ্রীর চাইতে) অনেকগুণে উত্তম যদি তোমরা বুঝতে চাও। (অতএব পরকালের সামগ্রী বেশি এবং পার্থিব সামগ্রী যতই কম হোক।) এবং (কম-বেশির তফাৎ ছাড়া আরও তফাৎ এই যে,) যা কিছু তোমাদের কাছে (দুনিয়াতে) আছে, তা (একদিন) নিঃশেষ হয়ে যাবে (হাত-ছাড়া হওয়ার কারণে কিংবা মৃত্যুর কারণে) এবং যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে, তা চিরকাল থাকবে। যারা (অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি ধর্মীয় বিধানে) দৃঢ়পদ আছে, আমি ভাল কাজের বিনিময়ে তাদের পুরস্কার (অর্থাৎ উল্লিখিত চিরস্থায়ী নিয়ামত) অবশ্যই তাদেরকে দেব। (সুতরাং অঙ্গীকার পূর্ণ করে প্রচুর অক্ষয় ধন অর্জন কর এবং অল্প ধ্বংসশীল সামগ্রীর জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম ঃ যেসব লেনদেন ও চুক্তি মুখে জরুরী করে নেওয়া হয় অর্থাৎ দায়িত্ব নেওয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই عهد শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াতসমূহ প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহসানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। عدل শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত। ---(কুরতুবী)

কারও সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা খুব বড় গোনাহ্‌। কিন্তু এ ভঙ্গ করার কারণে কোন নির্দিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না ; বরং পরকালে শাস্তি হবে। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা খাড়া করা হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গোনাহ্‌। পরকালে বিরাট শাস্তি হবে এবং দুনিয়াতেও কোন কোন অবস্থায় কাফফারা জরুরী হয়। ---(কুরতুবী)

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ----এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে জাগতিক স্বার্থ ও উপকারের জন্য সে চুক্তি ভঙ্গ করো না। উদাহরণত তোমরা অনুভব কর যে, যে দল অথবা পার্টির সাথে চুক্তি হয়েছে, তারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব। তাদের বিপরীতে অপর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী অথবা ধনাঢ্য। এমতাবস্থায় শুধু এই লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক হবে,

প্রথম পার্টির সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েয নয়; বরং তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পার্টির সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা যদি শরীয়তবিরোধী কাজকর্ম করে বা করায় তবে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয। শর্ত এই যে, পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না। فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে উপরোক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা মানসিক স্বার্থ ও বাসনার বশবর্তী হয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, না আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে মানসিক প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়?

ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খেলে ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে ঃ

لَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا ——এ আয়াতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা রাখে এবং শুধু অপরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতে অধিক বিপজ্জনক গোনাহ্। এর পরিণতিতে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। أَنْ تَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا বাক্যের উদ্দেশ্য তাই।

ঘুষ নেওয়া কঠোর হারাম এবং আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ঃ

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ——অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ভঙ্গ করো না। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নিয়ামত ও ধনসম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোন বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্য আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারও কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব, কারও কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সবরকম ঘুষই হারাম। উদাহরণত সরকারী কর্মচারী কোন কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখন যদি সে একাজ করার জন্য কারও কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে টালবাহানা করে, তবে সে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, ঘুষ নিয়ে তা করাও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল।---(বাহ্‌রে মুহীত)

ঘুষের সংজ্ঞা ঃ ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় ঘুষের সংজ্ঞাও এসে গেছে। তফসীর বাহ্‌রে মুহীতের ভাষায় তা এই ঃ

اخذ الا موال على ما يجب على الا خذ فعله او فعل ما يجب عليه تركه

অর্থাৎ যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্য ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। ---(বাহ্‌রে মুহীত, ৫৩৩ পৃঃ, ৫ম খণ্ড)

সমগ্র বিশ্বের সমগ্র নিয়ামত যে অল্প, তা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ----অর্থাৎ যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে (এতে পার্থিব মুনাফা বোঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের সওয়াব ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দুনিয়ার সুখ-দুঃখ বন্ধুত্ব-শত্রুতা সবই ধ্বংসশীল এবং এগুলোর ফলাফল ও পরিণতি, যা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে, যা চিরকাল বাকী থাকবে ঃ مَا عِنْدَكُمْ শব্দ বলতে সাধারণত ধনসম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন সাহেব মরহুম বলেন ঃ مَا শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোন শরীয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পার্থিব ধনসম্পদ তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা, অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে সওয়াব ও আযাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে থাকবে। অতএব ধ্বংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আযাব ও সওয়াবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

دوران بقا چو باد صحرا بگذشت
تلخی وخوشی وزشت وزیبا بگذشت
پنداشت ستمگرے جفا برما کرد
برگردن وے بماند وبرما بگذشت

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

(৯৭) যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অঙ্গীকার পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের নিন্দা বর্ণিত হয়েছিল। এটা ছিল একটি বিশেষ কাজ। আলোচ্য আয়াতে যাবতীয় সৎকর্ম এবং সৎকর্মীদের ব্যাপক বর্ণনা রয়েছে। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব এবং দুনিয়ার বরকত শুধু অঙ্গীকার পালনের মধ্যে সীমিত নয় এবং কোন কর্মীরও কোন বৈশিষ্ট্য নেই; বরং সামগ্রিক নীতি এই যে,) যে কেউ কোন সৎ কাজ করে, পুরুষ হোক কিংবা নারী---শর্ত এই যে, সে যদি ঈমানদার হয় (কেননা কাফিরের সৎ কর্ম গ্রহণীয় নয়), তবে আমি তাকে (দুনিয়াতে তো) আনন্দময় জীবন দেব এবং (পরকালে) তাদের উত্তম কাজের বিনিময়ে তাদের পুরস্কার দেব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'হায়াতে তাইয়্যেবা' কি? সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদের মতে পারলৌকিক জীবন বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনও অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মু'মিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক. অল্পেতুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই. তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফির ও পাপাচারী ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে

তার জন্য সান্ত্বনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শ আত্ম-হত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনেরও অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেল অর্বপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ ঈমানদার সৎকর্মশীলদের আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও প্রফুল্লতা ও আনন্দঘন জীবন দান করেন, যা কোন অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না। সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় যে জীবন আনন্দময় হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না ; বিশেষত একারণে যে, অনাবশ্যক সম্পদ বাড়ানোর লোভ তাদের মধ্যে থাকে না। এটাই সর্বাবস্থায় উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তারা যদি অভাব-অনটন অথবা অসুস্থতারও সম্মুখীন হয়, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াদার উপর তাদের পরিপূর্ণ আস্থা এবং কষ্টের পরেই সুখ পাওয়ার দৃঢ় আশা তাদের জীবনকে নিরানন্দ হতে দেয় না। যেমন কৃষক ক্ষেতে শস্য বপনের পর তার নিড়ানি-বাছানি ও জল সেচনের সময় যত কষ্টই করুক, সব তার কাছে সুখ বলে অনুভূত হয়। কেননা, কিছু দিন অতিবাহিত হলেই সে এর বিরাট প্রতিদান পাবে। ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসায়ে, চাকরিজীবী তার দায়িত্ব পালনে কতই না পরিশ্রম করে, এমনকি মাঝে মাঝে অপমানও সহ্য করে, কিন্তু একারণে আনন্দিত থাকে যে, কয়েক দিন পর সে ব্যবসায়ে বিরাট মুনাফা অথবা চাকরির বেতন পাবে বলে বিশ্বাস রাখে। মু'মিনও বিশ্বাস রাখে যে, প্রত্যেক কষ্টের জন্য সে প্রতিদান পাচ্ছে এবং পরকালে এর প্রতিদান চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে পাওয়া যাবে। পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের কোন মূল্য নেই। তাই এখানে সে সুখ-দুঃখ এবং ঠাণ্ডা-গরম সব কিছুই হাসিমুখে সহ্য করে যায়। এমতাবস্থায়ও তার জীবন উদ্বেগজনক ও নিরানন্দ হয় না। এটাই হচ্ছে 'হায়াতে তাইয়্যেবা', যা মু'মিন দুনিয়াতে নগদ পায়।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ
لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا
سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

(৯৮) অতএব যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করুন। (৯৯) তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার ভরসা রাখে। (১০০) তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎ কর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিতাড়িত শয়তান

থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কোরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কোরআন তিলাওয়াত এমন একটি কাজ, যদ্দ্বারা শয়তান পলায়ন করে, دیو بگریزد از ان قوم کہ قران خوانند

যারা কোরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়। এ ছাড়া কোন কোন বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানী প্রভাব দূর করার জন্য পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। (বয়ানুল-কোরআন)

এ সত্ত্বেও যখন কোরআন তিলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায় এটা আরও জরুরী হয়ে যায়।

এ ছাড়া স্বয়ং কোনআন তিলাওয়াতের মধ্যে শয়তানী কুমন্ত্রণারও আশংকা থাকে। ফলে তিলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তা-ভাবনা ও বিনয়-নম্রতা থাকে না। এ জন্যও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর, মাযহারী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইতিপূর্বে সৎ কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানা গেল। শয়তান মাঝে মাঝে এতে ত্রুটি সৃষ্টি করে। কোন সময় অঙ্গীকার পালনে এবং কোন সময় অন্য কাজ যেমন কোরআন তিলাওয়াতেও ত্রুটি সৃষ্টি করে) অতএব (হে মুহাম্মদ, আপনি এবং আপনার মাধ্যমে আপনার উম্মতের লোকগণ শুনে নিন) যখন আপনি কোরআন পাঠ করতে চান, তখন বিতাড়িত শয়তান (এর অনিষ্ট) থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (আসলে তো মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে এটাই ওয়াজিব। মুখে পড়ে নেওয়াও সুন্নত। আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ আমি এজন্য দেই যে,) নিশ্চয় তার জোর তাদের উপর চলে না, যারা ঈমানদার এবং পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তার জোর শুধু তাদের উপরই চলে, যারা তার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাদের উপর (চলে), যারা আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেনঃ মানুষের শত্রু দু'রকম। এক. স্বয়ং মানবজাতির মধ্য থেকে; যেমন সাধারণ কাফির। দুই. জিনদের মধ্য থেকে অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার শত্রুকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্য শুধু আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জিহাদ ও লড়াই ফরয করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা

দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনাসামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্য এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান কারও দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আযাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কাফিরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও সওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশত্রুর মুকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক---জয়ী হলে শত্রুর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াবের অধিকারী হবে।

মাস'আলা ঃ কোরআন তিলাওয়াতের সময় 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেন নি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিক সংখ্যক আলিম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়---সুন্নত বলেছেন। ইবনে জরীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন। ---এ সম্পর্কে উক্তিগত ও কর্মগত যত হাদীস রয়েছে, তিলাওয়াতের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ্' অধিকাংশ অবস্থায় পড়ার এবং কোন অবস্থায় না পড়ার---সব বিবরণ ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের শুরুতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

নামাযে আউযুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাক'আতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাক আতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবূ হানীফার মতে শুধু প্রথম রাক'আতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উভয়পক্ষের প্রমাণাদি তফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন তিলাওয়াত নামাযে হোক কিংবা নামাযের বাইরে---উভয় অবস্থাতেই তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যত বারই তিলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিল্লাহই যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তিলাওয়াত বাদ দিয়ে কোনো সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পুনর্বার তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ্ পড়ে নেওয়া উচিত।

কোরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ্ পড়া উচিত।--(দুররে মুখতার)

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহ্‌র শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণত কারও অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়।---(ইবনে কাসীর)

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবসে ওয়াল খাবায়েসে' পাঠ করা মোস্তাহাব।---(শামী)

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ ঃ এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতা-বশত কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তার দোষ। তাই বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে, কেননা তিনিই সৎ কাজের তওফীক-দাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী, এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধি-পত্য বিস্তার করতে পারে না। হ্যাঁ, যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোন সৎ কাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

সূরা হিজরের আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুও তাই। তাতে শয়তানের দাবীর বিপ-রীতে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দিয়েছেন إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ---অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর কোন জোর চালাতে পারবে না। তবে তার উপর চলবে, যে নিজেই বিপথগামী হয় এবং তোর অনুসরণ করতে থাকে।

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا
أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ
الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَّ
بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ
بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ
عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ
اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

(১০১) এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন, বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক জানে না। (১০২) বলুন, একে পবিত্র ফেরেশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন, যাতে মু'মিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ-স্বরূপ। (১০৩) আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলেঃ তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়। (১০৪) যারা আল্লাহ্‌র কথায় বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১০৫) মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না। এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্বাপর সম্পর্কঃ পূর্ববর্তী আয়াতে কোরআন তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ্ পড়ার নির্দেশ ছিল। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শয়তান কোরআন তিলাওয়াতের সময় মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহে শয়তানের এমনি ধরনের কুমন্ত্রণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

নবুয়ত সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহের তিরস্কারপূর্ণ জওয়াবঃ যখন আমি কোন আয়াত অন্য আয়াতের স্থলে পরিবর্তন করি, (অর্থাৎ এক আয়াতকে শব্দগত অথবা অর্থগতভাবে রহিত করে তৎস্থলে অন্য আদেশ দেই) অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশ (প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার) প্রেরণ করেন (তার উপযোগিতা ও তাৎপর্য) তিনিই ভাল জানেন (যে, যাদেরকে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের অবস্থা অনুযায়ী এক সময়ে এক উপযোগিতা ছিল, অতঃপর অবস্থার পরিবর্তনে উপযোগিতা ও তাৎপর্য অন্যরূপ হয়ে গেছে) তখন তারা বলেঃ (নাউযুবিল্লাহ্!) আপনি (আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে) মনগড়া উক্তি করেন [নিজের কথাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। তা না হলে আল্লাহ্‌র আদেশ হলে তা পরিবর্তন করার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ্ কি পূর্বে জানতেন না? তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে না যে, মাঝে মাঝে সব অবস্থা জানা থাকা সত্ত্বেও প্রথম অবস্থায় প্রথম আদেশ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দেওয়ার কথা যদিও তখন জানা থাকে, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে তখন দ্বিতীয় অবস্থার আদেশ বর্ণনা করা হয় না; বরং অবস্থাটি যখন দেখা দেয়, তখনই তা বর্ণনা করা হয়। উদাহরণত ডাক্তার এক ওষুধ মনোনীত করে এবং সে জানে যে, এটা ব্যবহার করলে অবস্থা পরিবর্তিত হবে এবং অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। কিন্তু রোগীকে প্রথমেই সব বিবরণ বলে না। কোরআন ও হাদীসেও বিধি-বিধান রহিত করার স্বরূপ তাই। যে ব্যক্তি এ স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, সে শয়তানের প্ররোচনায় নসখ অর্থাৎ রহিতকরণকে অস্বীকার করে। এ জন্যই এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) মনগড়া কথা বলেন না] বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক মূর্খ (ফলে বিধি-বিধানের রহিতকরণকে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই

আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার পরিপন্থী মনে করে।), আপনি (তাদের জওয়াবে) বলে দিনঃ (এই কালাম আমার রচিত নয়; বরং) একে পবিত্র আত্মা (অর্থাৎ জিবরাঈল) পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাৎপর্যের প্রেক্ষাপটে আনয়ন করেছেন, (তাই এটা আল্লাহ্‌র কালাম। বস্তুত বিধানের পরিবর্তন তাৎপর্য ও উপযোগিতার তাগিদে হয়। এই কালাম এজন্য প্রেরিত হয়েছে) যাতে ঈমানদারদেরকে (ঈমানের উপর) দৃঢ়পদ রাখেন এবং মুসলমানদের জন্য হিদায়ত ও সুসংবাদ (-এর উপায়) হয়ে যায়। (এরপর কাফিরদের আরও একটি অনর্থক সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে) আমি জানি, তারা (অন্য একটি ভ্রান্ত কথা) আরও বলে যে, তাকে তো জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দান করে [এতে একজন অনারব, রোমের অধিবাসী কর্মকারকে বোঝানো হয়েছে। তার নাম বাল'আম অথবা মকীস। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই সে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে বসত। সে ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থও কিছু কিছু জানত। এ থেকেই কাফিররা রটিয়ে দেয় যে, এ ব্যক্তিই মুহাম্মদকে কোরআনের কালাম শিক্ষা দেয়।---(দুররে মনসূর) আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াব দিয়েছেন যে, কোরআন শব্দ ও অর্থের সমষ্টিকে বলা হয়। তোমরা যদি কোরআনের অর্থ ও তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম না হও, তবে কমপক্ষে আরবী ভাষার উচ্চমান অলংকার সম্পর্কে তো অনবগত নও। অতএব তোমাদের এতটুকু বোঝা উচিত যে, যদি ধরে নেওয়া যায়, কোরআনের অর্থ-ভাণ্ডার এই ব্যক্তি শিখিয়ে দিয়েছে, তবে কোরআনের ভাষা ও তার অনুপম অলংকার, যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব অক্ষম---কোত্থেকে এসে গেল? কেননা] যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা অনারব এবং এ কোরআনের ভাষা সুস্পষ্ট আরবী। [কোন অনারব ব্যক্তি এমন বাক্যাবলী কিরূপে রচনা করতে পারে? যদি বলা হয় যে, বাক্যাবলী রসূলুল্লাহ্ (সা) রচনা করে থাকবেন, তবে ঐ চ্যালেঞ্জ দ্বারা এর পুরোপুরি জওয়াব হয়ে গেছে, যা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র আদেশে স্বীয় নবুয়ত ও কোরআনের সত্যতার মাপকাঠি এ বিষয়কেই স্থির করেছিলেন যে, তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী কোরআন মানবরচিত কালাম হলে তোমরাও তো মানুষ এবং অনুপম ভাবালংকারের দাবীদার। অতএব তোমরা তদনুরূপ কালাম বেশি না হোক এক আয়াত পরিমাণেই লিখে আন। কিন্তু সমগ্র আরব তাঁর বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। এরপর নবুয়ত অস্বীকারকারী এবং কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে,] যারা আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ কখনো সুপথে আনবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (এরা যে আপনাকে, নাউযুবিল্লাহ ---মিথ্যা কালাম রচয়িতা বলছে) মিথ্যা রচনাকারী তো তারাই; যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস রাখে না এবং এরা পুরোপুরি মিথ্যাবাদী।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ

بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ
اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾

(১০৬) যার উপর জোরজবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। (১০৭) এটা এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (১০৮) এরাই তারা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কাণ্ডজ্ঞানহীন। (১০৯) বলা বাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ্‌র সাথে কুফ্‌রী করে (এতে রসূলের সাথে কুফ্‌রী এবং কিয়ামত অস্বীকার ইত্যাদি সবই বোঝানো হয়েছে।) কিন্তু যার উপর (কাফিরদের পক্ষ থেকে) জবরদস্তি করা হয় (যে, যদি তুমি অমুক কুফ্‌রী কাজ না কর বা কথা না বল তবে আমরা তোমাকে হত্যা করব এবং অবস্থাদৃষ্টে বোঝাও যায় যে, তারা এরূপ করতে পারে তবে,) শর্ত এই যে, যদি তার অন্তর ঈমানে অটল থাকে (অর্থাৎ বিশ্বাসে কোনরূপ ত্রুটি না আসে এবং একথা ও কাজকে বিরাট গোনাহ্‌ ও মন্দ মনে করে, তবে সে বর্ণিত ধর্মত্যাগের শাস্তির যোগ্য হবে না এবং বাহ্যত তার কুফ্‌রী বাক্যে অথবা কাজে লিপ্ত হওয়া একটি ওযরের কারণে হবে। তাই পরবর্তী বাক্যে ধর্ম ত্যাগের যে শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে, তা এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না)। অবশ্য যে ব্যক্তি মন খুলে (অর্থাৎ এ কুফরকে বিশুদ্ধ ও উত্তম মনে করে) কুফ্‌রী করে, এরূপ লোকদের উপর আল্লাহ্‌র গযব আপতিত হবে এবং তাদের বিরাট শাস্তি হবে (এবং) এই (গযব ও শাস্তি) এই কারণে হবে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং এই কারণে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এরূপ অবিশ্বাসী লোকদেরকে (যারা ইহকালকে পরকালের উপর সবসময় অগ্রাধিকার দেয়) পথ প্রদর্শন করেন না। (এ দু'টি কারণ পৃথক

পৃথক নয়; বরং একই কারণের সমষ্টি। এর সারমর্ম এই যে, কাজের সংকল্প করার পর আল্লাহ্‌র রীতি অনুযায়ী কাজের সৃষ্টি হয়। এর উপর ভিত্তি করে কাজের বিকাশ ঘটে। আয়াতে اِسْتَحَبُّوا দ্বারা সংকল্প এবং لَا يَهْدِى দ্বারা কাজ সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতদুভয়ের সমষ্টির উপর ভিত্তি করে সমস্ত কাজের বিকাশ ঘটেছে।) এরা তারা যে, (দুনিয়াতে তাদের কুফর প্রীতির অবস্থা এই যে,) আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর, কর্ণের উপর এবং চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা (পরিণাম থেকে) সম্পূণ গাফিল। (তাই) নিশ্চিত কথা এই যে, পরকালে তারা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফ্‌রী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফ্‌রী কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোন গোনাহ্ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফ্‌রী কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে।---(কুরতুবী, মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফ্‌রী অবলম্বন করতে বলেছিল।

যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা, সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব (রা)। তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াসির ও তদীয় সহধর্মিণী সুমাইয়্যা কুফ্‌রী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। হযরত ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং হযরত সুমাইয়্যাকে দু' উটের মাঝখানে বেঁধে উট দু'টিকে দু'দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দু'জন মহাত্মাই ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত খাব্বাবও কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করে নেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আম্মার প্রাণের ভয়ে কুফ্‌রীর মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি যখন কুফ্‌রী কালাম বলেছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল? তিনি আরয করলেন ঃ আমার অন্তর ঈমানের উপর স্থির এবং অটল ছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা ঃ اكراه--এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোর-জবরদস্তির দু'টি পর্যায় রয়েছে। এক, মনে-প্রাণে তাতে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষম ও অবশও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ স্তরকে اكراه غير ملجى বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির কারণে কুফ্‌রী বাক্য অথবা কোন হারাম কাজ করা জায়েয নয়। তবে কোন কোন খুঁটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্‌ শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে।

জোর-জবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারক করে দেওয়া যে, সে যদি জোর-জবরদস্তিকারীদের কথামত কাজ না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা তার কোন অঙ্গহানি করা হবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে اكراه ملجى বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফ্‌রী কলিমা উচ্চারণ করা জায়েয। এমনিভাবে কাউকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোন গোনাহ্‌ নেই।

কিন্তু উভয় প্রকার জোর-জবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের হুমকি দেয়, তা বাস্তবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমকি দেওয়া হয়, তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে।---(মাযহারী)

লেনদেন দু'প্রকার। এক. যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য ; যেমন কেনা-বেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আন্তরিকভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কোরআন বলে ঃ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ---অর্থাৎ অপরের মাল হালাল হয় না যে পর্যন্ত উভয়পক্ষের সম্মতিতে ব্যবসা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। হাদীসে আছে, لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه---অর্থাৎ কোন মুসলমানের মাল হালাল হয় না, যে পর্যন্ত সে মনের খুশিতে তা দিতে সম্মত না হয়।

এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে--জোর-জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনা-বেচা অথবা দান-খয়রাত ইচ্ছা করলে সে বহালও রাখতে পারে, না হয় বাতিলও করে দিতে পারে।

কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো শুধু মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা, সম্মতি, খুশি ইত্যাদি শর্ত নয় ; যেমন বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, গোলাম মুক্তকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ثلاث جدهن جد هزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة—رواه ابوداود والترمذى

অর্থাৎ দু'ব্যক্তি যদি মুখে বিয়ের ইজাব-কবূল শর্তানুযায়ী করে নেয় অথবা কোন স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথবা তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয় হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে, তালাক হয়ে যাবে এবং প্রত্যাহারও শুদ্ধ হবে।--(মাযহারী)

ইমাম আযম আবূ হানীফা, শা'বী, যুহরী, নখয়ী ও ক্বাতাদাহ্ (রহ) প্রমুখ বলেন ঃ জবরদস্তির অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক শুধু তালাক শব্দ বলে দেওয়ার সাথে--মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয়; যেমন পূর্বোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে জবরদস্তি অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা হাদীসে আছে,--- رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه --অর্থাৎ আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে নেওয়া হয়েছে!

ইমাম আবূ হানীফার মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোন কথা অথবা কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্য কোন গোনাহ্ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফলন অনুভূত ও চাক্ষুস। এর প্রতিফলনের কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণত একজন অন্য জনকে ভুলবশত হত্যা করল। এখানে হত্যার গোনাহ্ এবং পরকালের শাস্তি নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু হত্যার চাক্ষুস পরিণতি অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরীয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইদ্দতের পর পুনর্বিবাহ করতে পারবে এবং তার ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিবাহের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার শরীয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে।---(মাযহারী, কুরতুবী)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ

نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً
يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ
فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ
جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ
ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾

(১১০) যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জিহাদ করেছে নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১১) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে সওয়াল-জওয়াব করতে করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না। (১১২) আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে মজা আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির। (১১৩) তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল আগমন করেছিলেন। অনন্তর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল। তখন আযাব এসে ওদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই ওরা ছিল পাপাচারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুফরের শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল; আসল কুফর হোক কিংবা ধর্ম ত্যাগের কুফর। এর পর আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যে কাফির কিংবা ধর্ম-ত্যাগী সত্যিকার ঈমান আনে, তার বিগত সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। ঈমান এমনি এক অমূল্য সম্পদ।

দ্বিতীয় আয়াতে কিয়ামতের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতের পরেই হবে। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহ্‌র আসল শাস্তি কিয়ামতের পরেই পাওয়া যাবে, কিন্তু কোন কোন গোনাহ্‌র কিছু কিছু শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। আয়াতের সংক্ষিপ্ত তফসীর এইরূপ ঃ

এর পর (যদি কুফরের পরে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে তবে) নিশ্চয় আপনার পালন-কর্তা তাদের জন্য, যারা কুফরে লিপ্ত হওয়ার পর (ঈমান আনয়ন করে) হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং (ঈমানে) অবিচল রয়েছে, আপনার পালনকর্তা (তাদের জন্য) এ সবের (অর্থাৎ এসব আমলের) পর অত্যন্ত ক্ষমাকারী, দয়ালু। (অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের বরকতে অতীতের যাবতীয় গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে তারা জান্নাতে উচ্চ উচ্চ শ্রেণী পাবে। কুফর ও পূর্ববর্তী গোনাহ্ তো শুধু ঈমান দ্বারাই মাফ হয়ে যায়---জিহাদ ইত্যাদি সৎ কর্ম গোনাহ্ মাফ হওয়ার জন্য শর্ত নয়---কিন্তু সৎ কর্ম জান্নাতে উচ্চ শ্রেণী পাওয়ার কারণ। তাই এরই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিদান ও শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে কথা বলবে (এবং অন্যান্যের ব্যাপারে কিছু বলবে না) এবং প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে। (অর্থাৎ সৎ কাজের প্রতিদান কম হবে না, যদিও আল্লাহ্র রহমতে কিছু বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের বিনিময় বেশি হবে না, যদিও আল্লাহ্র রহমতে কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটাই পরবর্তী বাক্যের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ) তাদের উপর জুলুম করা হবে না (এর পর বলা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহ্র পূর্ণ শাস্তি হাশরের পরে হবে, কিন্তু কোন সময় দুনিয়াতেও এর শাস্তি আযাব আকারে এসে যায়।) আল্লাহ্ তা'আলা একটি জনপদের অধিবাসীদের বিচিত্র অবস্থা বর্ণনা করেন। তারা (খুব) সুখ ও শান্তিতে বসবাস করত (এবং) তাদের আহার্যও প্রচুর পরিমাণে চতুর্দিক থেকে তাদের কাছে পৌঁছাত। (আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় না করে বরং) তারা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের না-শোকরী করল (অর্থাৎ কুফর, শিরক ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ল।) ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের কারণে একটি সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করালেন (অর্থাৎ তারা ধন-দৌলতের প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধায় পতিত হল এবং শত্রুর ভয় চাপিয়ে দিয়ে তাদের সে জনপদের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত করা হল।) এবং (এ শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি করা হয়নি; বরং প্রথমে তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য) তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূলও (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আগমন করল (যাঁর সততা ও ধর্মপরায়ণতার অবস্থা তাদের স্বজাতিভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের খুব ভাল করে জানা ছিল।) তাঁকে (রসূলকেও) তাহারা মিথ্যাবাদী বলল। তখন তাদেরকে আযাব এসে ধৃত করল এমতাবস্থায় যে, তারা জুলুমে বদ্ধপরিকর ছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শেষ আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্য 'লেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোশাক আস্বাদন করার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়। ক্ষুধা এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে।

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোন বস্তির সাথে নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া মুসলমানদের ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করল যে, কুফর ও অবাধ্যতার দোষে তো পুরুষরা দোষী হতে পারে। কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এর পর রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জন্য মদীনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন। ---(মাযহারী)

আবূ সুফিয়ান কাফির অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করে যে, আপনি তো আত্মীয় তোষণ, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জন্য দোয়া করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।---(কুরতুবী)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ
كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا
عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ
اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى
الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا
ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ
لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْۗءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٩﴾

(১১৪) অতএব আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক। (১১৫) অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা জবাই কালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালংঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১৬) তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে সেভাবে তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না। (১১৭) যৎ সামান্য সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিক। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১১৮) ইহুদীদের জন্য আমি তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম যা ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই নিজেদের উপর জুলুম করত। (১১৯) অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাকারী, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও তাঁর আযাবের উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে মুসলমানদেরকে অকৃতজ্ঞ না হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যেসব হালাল নিয়ামত দিয়েছেন, সেগুলো কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এর পর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার হালাল করা অনেক বস্তুকে নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম বলা এবং আল্লাহ্ তা'আলার হারাম করা অনেক বস্তুকে হালাল বলা---এটা ছিল কাফির ও মুশরিকদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অন্যতম পদ্ধতি। মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, তারা যেন এরূপ না করে। কোন বস্তুকে হালাল অথবা হারাম করার অধিকার একমাত্র সে সত্তারই রয়েছে, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের পক্ষ থেকে এরূপ করা আল্লাহ্র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপেরই নামান্তর।

অবশেষে আরো বলা হয়েছে যে, যারা অজ্ঞতাবশত এ জাতীয় অপরাধ করেছে, তারাও যেন আল্লাহ্র অনুকম্পা থেকে নিরাশ না হয়। যদি তারা তওবা করে নেয় এবং বিশুদ্ধ ঈমান অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেবেন। আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, সেগুলোকে (হারাম মনে করো না ; কেননা এটা মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ প্রথা। বরং সেগুলোকে) খাও এবং আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর আদায় কর, যদি তোমরা (দাবী অনুযায়ী) তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক! (তোমরা যেসব বস্তুকে হারাম বল, সেগুলোর মধ্য থেকে তো) তোমাদের

প্রতি (আল্লাহ্ তা'আলা) শুধু মৃত জন্তুকে হারাম করেছেন এবং (হারাম করেছেন) রক্ত ও শূকরের মাংস (ইত্যাদি) এবং যে বস্তু অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) একেবারে অস্থির হয়ে যায়---স্বাদ অন্বেষণকারী ও (প্রয়োজনের) সীমালংঘনকারী না হয়, আল্লাহ্ তা'আলা (তার জন্য, যদি সেগুলো খেয়ে ফেলে) ক্ষমাকারী, দয়ালু। যেসব বস্তু সম্পর্কে তোমরা শুধু মৌখিক মিথ্যা দাবী কর (অথচ তার কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই), সেগুলো সম্পর্কে বলে দিয়ো না যে, অমুক বস্তু হালাল এবং অমুক বস্তু হারাম (যেমন, অষ্টম পারার চতুর্থাংশের কাছাকাছি وَجَعَلُوا لِلّٰهِ আয়াতে তাদের এসব মিথ্যা দাবী বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম হবে এই যে) তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করবে? (কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করেন নি; বরং এর বিপরীত বলেছেন)। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফল হবে না (হয় ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে, না হয় শুধু পরকালে) এটা ক্ষণস্থায়ী (পার্থিব) আয়েশ মাত্র। (সামনে মৃত্যুর পর) তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং মুশরিকরা ইব্রাহীমী দীনের অনুসারী হওয়ার দাবী করে, অথচ হযরত ইব্রাহীমের শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম ছিল না, সেগুলোকে তারা হারাম সাব্যস্ত করেছে। তবে (অনেক দিন পর সেগুলোর মধ্য থেকে) শুধু ইহুদীদের জন্য আমি ঐসব বস্তু হারাম করেছিলাম, যেগুলো ইতিপূর্বে (সূরা আন'আমে) আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। (এগুলোকে হারাম করার ব্যাপারে) আমি তাদের প্রতি (দৃশ্যতও) কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি (পয়গম্বরগণের বিরোধিতা করে জুলুম করত। সুতরাং জানা গেল যে, পবিত্র বস্তুসমূহকে ইচ্ছাকৃতভাবে তো কোন সময় হারাম করা হয়নি এবং ইব্রাহীমী শরীয়তে কোন সাময়িক প্রয়োজনেও হয়নি। এমতাবস্থায় তোমরা এগুলো কোথা থেকে গড়ে নিয়েছ?)

অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদের জন্য, যারা মূর্খতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলে (তা যাই হোক) অতঃপর সেজন্য তওবা করে নেয় এবং (ভবিষ্যতের জন্য) স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পর অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয়ঃ এ আয়াতে ব্যবহৃত إِنَّمَا শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লিখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক স্পষ্টভাবে قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোন বস্তু হারাম নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা আরও অনেক বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহিলিয়াত আমলের মুশরিকরা

নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল অথচ, আল্লাহ্ তদ্রূপ কোন নির্দেশ দেন নি, সেগুলো বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তফসীর এবং চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফুল-কোরআন প্রথম খণ্ডে সূরা বাক্বারার ১৭৩ আয়াতের তফসীরে দ্রষ্টব্য।

যে গোনাহ্ বুঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গোনাহ্ না বুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে ঃ আয়াতে إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ -এর جهل শব্দ নয় বরং جهالة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। جهل শব্দটি علم -এর বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে আসে। পক্ষান্তরে جهالة -এর অর্থ হয় মূর্খতাসুলভ কাণ্ড, যদিও তা বুঝে-সুঝে করা হয়। এতে বোঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বুঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহ্ই মাফ হয় না ; বরং যে গোনাহ্ সচেতনভাবে করা হয়, তাও মাফ হয়।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

(১২০) নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্রই অনুগত এবং তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২১) তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তাঁকে দুনিয়াতে দান করেছি কল্যাণ এবং তিনি পরকালেও সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১২৩) অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের দীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২৪) শনিবার দিন পালন

যে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা তাদের জন্যই যারা এতে মতবিরোধ করেছিল। আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শির্‌ক ও কুফরের মূল অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের অস্বীকৃতি খণ্ডন এবং কুফর ও শির্‌কের কতিপয় শাখা অর্থাৎ হারামকে হালাল করা ও হালালকে হারাম করার বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বাতিল করা হয়েছিল। কোরআন পাকের সম্বোধনের প্রথম ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়। মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এরা দাবী করত যে, তারা ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্মের অনুসারী এবং তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইব্রাহীম (আ)-এরই শিক্ষা। তাই আলোচ্য চারটি আয়াতে তাদের এ দাবী খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদেরই স্বীকৃত নীতি দ্বারা তাদের মূর্খতাসুলভ চিন্তাধারা বাতিল প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বাতিল এভাবে করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পাঁচ আয়াতের মধ্য থেকে প্রথম আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) বিশ্বের জাতিসমূহের সর্বজন স্বীকৃত অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এটা নবুয়ত ও রিসালতের সর্বোচ্চ স্তর। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন মহান পয়গম্বর ছিলেন। এর সাথেই مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন নিষ্কলুষ একত্ববাদী ছিলেন।

দ্বিতীয় আয়াতে তিনি যে কৃতজ্ঞ এবং সরল পথের অনুসারী ছিলেন, একথা বর্ণনা করে মুশরিকদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েও নিজেদেরকে কোন্ মুখে ইব্রাহীমে (আ)-এর অনুসারী বলে দাবী করছ ?

তৃতীয় আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আ) ইহকাল ও পরকালে সফলকাম ছিলেন। চতুর্থ আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র নবুয়ত প্রমাণ করার সাথে সাথে তিনি যে যথার্থ মিল্লাতে-ইব্রাহীমীর অনুসারী, একথা বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্য ব্যতীত এ দাবী সত্য হতে পারে না।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ—এই পঞ্চম আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মিল্লাতে ইব্রাহীমীতে পবিত্র বস্তুসমূহ হারাম ছিল না। তোমরা এগুলোকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছ। আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ ঃ

নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম [(আ) যাকে তোমরাও মান] একান্ত অনুসরণযোগ্য (অর্থাৎ দৃঢ়চেতা পয়গম্বর ও মহান উম্মতের অনুসরণযোগ্য নেতা), আল্লাহ্‌র পুরোপুরি আনুগত্যশীল ছিলেন (তাঁর কোন বিশ্বাস অথবা কর্ম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না। এমতাবস্থায় তোমরা তার বিপরীতে নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম সাব্যস্ত কর কেন ? তিনি) সম্পূর্ণ এক (আল্লাহ্‌)-মুখী ছিলেন। (একমুখী হওয়ার অর্থ এই যে) তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [এমতাবস্থায় কেমন করে তোমরা

শিরক কর? মোটকথা, ইব্রাহীম (আ)-এর এই ছিল অবস্থা ও আদর্শ। তিনি আল্লাহ্‌র এমন প্রিয় ছিলেন যে] আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মনোনীত করে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলেন। আমি তাঁকে ইহকালেও (নবুয়ত ও রিসালতের জন্য মনোনয়ন ও সরল পথপ্রদর্শন ইত্যাদির মত) বৈশিষ্ট্য দান করেছিলাম এবং তিনি পরকালেও (উচ্চ মর্তবার) পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (তাই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করাই তোমাদের সবার কর্তব্য। বর্তমানে সেই অনুপম আদর্শ দীনে মুহাম্মদীর মধ্যে সীমিত। এর বর্ণনা এই যে) অতঃপর আমি আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি যে, আপনি ইব্রাহীমের দীন, যিনি সম্পূর্ণ এক (আল্লাহ্)-মুখী ছিলেন, অনুসরণ করুন (যেহেতু সেকালে দীনে ইব্রাহীমীর দাবীদাররা কিছু না কিছু শিরকে লিপ্ত ছিল, তাই পুনশ্চ বলেছেন যে) তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (যাতে মূর্তি পূজারীদের সাথে সাথে ইহুদী ও খৃস্টানদের বর্তমান পন্থারও খণ্ডন হয়ে যায়। কারণ, তাদের পন্থা শিরক থেকে মুক্ত নয়। যেহেতু তারা পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম সাব্যস্ত করার মত মূর্খতাসুলভ ও মুশরিকসুলভ কুকাণ্ড ও কুপ্রথায় লিপ্ত ছিল, তাই বলা হয়েছে যে) শনিবারের সম্মান (অর্থাৎ শনিবার দিন মৎস্য শিকারের নিষেধাজ্ঞা, যা পবিত্র বস্তু হারাম করার অংশবিশেষ, তা তো) শুধু তাদের জন্যই অপরিহার্য করা হয়েছিল, যারা এতে (কার্যত) বিরুদ্ধাচরণ করেছিল অর্থাৎ কেউ মেনে নিয়ে তদনুরূপ কাজ করেছিল এবং কেউ বিপরীত কাজ করেছিল। এখানে ইহুদী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, পবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করার অন্যান্য প্রকারের মত এ প্রকারটি শুধু ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। দীনে-ইব্রাহীমীতে এসব বস্তু হারাম ছিল না। এরপর আল্লাহ্‌র বিধানাবলীতে মতবিরোধ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে---নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন (কার্যত) তাদের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়াতে) মতবিরোধ করত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أُمَّة (উম্মত) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। 'উম্মত' শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলীর আধার। কোন কোন তফসীরকারক এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। قَانِت শব্দের অর্থ আজ্ঞাবহ। হযরত ইব্রাহীম (আ) উভয় গুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুসৃত এ কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সবাই এক বাক্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানরা তো তাঁর প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মুশরিকরা মূর্তি পূজা সত্ত্বেও এ মূর্তি সংহারকের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তাঁর ধর্মের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত ইব্রাহীম (আ) যে আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সেসমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহ্‌র এ দোস্ত উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, পরিবার-

পরিজনকে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার পর পাওয়া পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়া---এসব স্বাতন্ত্র্যের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উল্লিখিত উপাধিসমূহে সম্মানিত করেন।

রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি দীনে ইব্রাহীমীর অনুসরণের নির্দেশ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে শরীয়ত ও বিধানাবলী হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে দান করেছিলেন, শেষ নবী (সা)-র শরীয়তও কতিপয় বিশেষ বিধান ছাড়া তদ্রূপ রাখা হয়েছে। যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা) পয়গম্বর ও রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ; কিন্তু এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্বল্পশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ করার নির্দেশ দানের পেছনে দু'টি তাৎপর্য কার্যকর। এক. সেই শরীয়ত পূর্বে দুনিয়াতে এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। সর্বশেষ শরীয়তও যেহেতু তদ্রূপ হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. আল্লামা যমখশরীর ভাষায় অনুসরণের এ নির্দেশও হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সম্মানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ সম্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি ثُمَّ (অতঃপর) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আ)-এর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি গুণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও হাবীবকে তাঁর দীনের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ
وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ
مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم
مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

(১২৫) আপন পালনকর্তার পথের পানে আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন, যে তাঁর পথ থেকে

বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। (১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম। (১২৭) আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহ্‌র জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। (১২৮) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহিযগার এবং যারা সৎ কর্ম করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উম্মত তাঁর বিধানাবলী বাস্তবায়িত করে রিসালতের কর্তব্য পালন করুক, এ উদ্দেশ্যেই পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রিসালত ও নবুয়ত সমান করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রিসালতের দায়িত্ব পালন ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপক শিক্ষার আওতায় সমস্ত মু'মিন মুসলমান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ ঃ

আপনি পালনকর্তার পথের (অর্থাৎ দীন ইসলামের) পানে (লোকদেরকে) জ্ঞানের কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিন। ('হিকমত' বলে দাওয়াতের সে পন্থা বোঝানো হয়েছে, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্তরে ক্রিয়াশীল হতে পারে---এমন কৌশল অবলম্বন করা হয়। উপদেশের অর্থ এই যে, শুভাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কথা বলতে হবে। উত্তম উপদেশের মর্ম এই যে, কথার ভাষাও যেন নরম হয়, মর্মবিদারক ও অপমানকর না হয়।) এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন (অর্থাৎ যদি তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাও কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, প্রতিপক্ষের প্রতি দোষারোপ এবং অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত হতে হবে। বস্তুত আপনার কর্তব্য এতটুকুই। এরপর এ খোঁজাখুঁজির পেছনে পড়বেন না যে, কে মানল এবং কে মানল না---এ কাজ আল্লাহ্ তা'আলার) আপনার পালনকর্তা সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই সঠিক পথের অনুগামীদেরও খুব জানেন আর যদি (কোন সময় প্রতিপক্ষ শিক্ষা বিষয়ক তর্ক-বিতর্কের সীমা অতিক্রম করে কার্যত ঝগড়া এবং হাত অথবা মুখের মাধ্যমে কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে এক্ষেত্রে আপনার এবং আপনার অনুসারীদের জন্য প্রতিশোধ নেওয়া এবং সবর করা উভয়টি জায়েয। অতঃপর যদি প্রথমোক্ত পথ অবলম্বন করেন, অর্থাৎ) প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই প্রতিশোধ নেবে, যতটুকু তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে (এর বেশি কিছু করো না) আর যদি (শেষোক্ত পথ অবলম্বন কর, অর্থাৎ নিপীড়নের পর) সবর কর, তবে তা (সবর করা) সবরকারীদের পক্ষে খুবই উত্তম। কারণ, প্রতিপক্ষ ও দর্শক সবার উপরই এর উত্তম প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং পরকালেও বিরাট সওয়াব পাওয়া যায়। আর (সবর করা যদিও সবার পক্ষেই উত্তম, কিন্তু আপনার মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে বিশেষভাবে আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে যে, আপনি প্রতিশোধের পথ বেছে নেবেন না; বরং) আপনি সবর করুন। আপনার সবর করা আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ তওফীকের বদৌলতে হয়ে থাকে (তাই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন

যে, সবর করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে না) এবং তাদের (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে অথবা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার) কারণে আপনি দুঃখ করবেন না, এবং তারা যেসব চক্রান্ত করে, তজ্জন্য মন ছোট করবেন না। (তাদের বিরোধী চক্রান্ত দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আপনি সৎ কর্ম ও আল্লাহ্‌ ভীতির গুণে গুণান্বিত এবং) আল্লাহ্‌ এমন লোকদের সঙ্গে রয়েছেন (অর্থাৎ তাদের সাহায্য করেন) যারা আল্লাহ্‌-ভীরু এবং সৎকর্মপরায়ণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম ঃ আলোচ্য আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। তফসীর কুরতুবীতে রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়ানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অনুরোধ করল ঃ আমাদেরকে কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ ' মানুষ সাধারণত অর্থসম্পদের ব্যাপারে ওসীয়ত করে। অর্থসম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতসমূহ বিশেষত সূরা নাহ্‌লের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে ওসীয়ত করছি। এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে। উল্লিখিত আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত।

دعوة–এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আহবান করা। পয়গম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করা। এরপর নবী ও রসূলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র বিশেষ পদবী হচ্ছে আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী হওয়া। সূরা আহ্‌যাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا এবং সূরা আহকাফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ

রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেওয়া উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে আছে ঃ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থাৎ) সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।

অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ — অর্থাৎ কথা-বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয় ?

বর্ণনায় বিষয়টিকে কোন সময় الدعوة الى الله কোন সময় الدعوة الى الخير এবং কোন কোন সময় الدعوة الى سبيل الله শিরোনাম দেওয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা তাঁর দীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ---এতে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ رب (পালনকর্তা) উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে, তার উপর বোঝা না চাপে এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা, পয়গম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধি-বিধান পৌঁছিয়ে দেওয়া ও শুনিয়ে দেওয়াই নয়; বরং লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেওয়াও বটে। বলা বাহুল্য। যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা করে না।

بِالْحِكْمَةِ---'হিকমত' শব্দটি কোরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোন কোন তফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কোরআন, কেউ কেউ কোরআন ও সুন্নাহ্ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। রূহুল মা'আনী বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তফসীর নিম্নরূপ করেছেন: انها الكلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع---অর্থাৎ ঐ বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রূহুল বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন: "হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।"

وعظ ও موعظة-الموعظة---এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবূল করার জন্য নরম হয়ে যায়। উদাহরণত তার কাছে কবূল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবূল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা করা---(কামূস, মুফরাদাতে-রাগিব)

اَلْحَسَنَةُ-এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই--শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলছেন।

مَوْعِظَةٌ শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে।---(রূহুল মা'আনী)

এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য حَسَنَةٌ শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

جَادِلْ—وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ শব্দটি مُجَادَلَةٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এখানে مُجَادَلَةٌ বলে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ -এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথা-বার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ অবলম্বন না করে। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতক' শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহ্‌লে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কোরআন বলে যে,

وَلَا تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ---অন্য আয়াতে হযরত মূসা ও হারূন (আ)-কে فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا নির্দেশ নিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, ফিরাউনের মত অবাধ্য কাফিরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার ঃ আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে--এক. হিকমত। দুই. সদুপদেশ এবং তিন. উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক। কোন কোন তফসীরকারক বলেন ঃ এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য বর্ণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুধীজনের জন্য, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্য এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্য যাদের অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে বলেন ঃ এ তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য হওয়া আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক মনে হয়।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠু পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহার্য। কেননা, দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা দ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনাভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতিপূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাঙ্ক্ষাবশত বলছে—আমাকে শরমিন্দা করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়।

অবশ্য রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এ স্থলে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে জানা যায় আসলে দু'টি বিষয়ই দাওয়াতর মূলনীতি—হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোন কোন সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ ব্যাপারে উপরোক্ত গ্রন্থকারের যুক্তি এই যে, যদি তিনটি বিষয়ই মূলনীতি হত, তবে স্থানের তাগিদ অনুসারে তিনটি বিষয়কেই عطف যোগে এভাবে বর্ণনা করা হত بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الاحسن কিন্তু কোরআন পাক হিকমত ও উপদেশকে عطف যোগে একই পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে কিন্তু বিতর্কের জন্য আলাদা বাক্য جادلهم بالتى هى احسن অবলম্বন করেছে। এতে জানা যায় যে, শিক্ষা বিষয়ক বিতর্ক আসলে দাওয়াতের স্তম্ভ অথবা শর্ত নয়; বরং দাওয়াতের পথে সংঘটিত ব্যাপারাদি সম্পর্কে একটি নির্দেশ মাত্র। যেমন, এর পরবর্তী আয়াতে সবর করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, দাওয়াতের পথে মানুষ যে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তজ্জন্য সবর করা অপরিহার্য।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীতি দু'টি—হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোন দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলিম ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেওয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় তর্ক-বিতর্ক করার শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে بالتى هى احسن এর শর্ত জুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যে তর্ক-বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরীয়তে তার কোন মর্যাদা নেই।

দাওয়াতের পয়গম্বরসুলভ শিষ্টাচার ঃ দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে পয়গম্বরগণের দায়িত্ব। আলিমরা যেহেতু তাঁদের স্থলাভিষিক্ত, তাই তাঁরা এ পদমর্যাদা ব্যবহার করেন। অতএব দাওয়াতের আদব ও রীতিনীতি তাদের কাছ থেকেই শিক্ষা করা অপরিহার্য। যে দাওয়াত তাঁদের কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, সেটি দাওয়াতের পরিবর্তে 'আদাওয়াত' (শত্রুতা) এবং কলহ-বিবাদের কারণ হয়ে যায়।

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের মূলনীতি সম্পর্কে কোরআন পাকে হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর প্রতি নির্দেশ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছেঃ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ---অর্থাৎ ফিরাউনের সাথে নম্র কথা বল; সম্ভবত সে বুঝে নেবে কিংবা ভীত হবে। প্রত্যেক দাওয়াতদাতার সম্মুখে সর্বক্ষণ এ নীতিটি থাকা জরুরী। ফিরাউনের মত পাষণ্ড কাফির সম্পর্কে আল্লাহ্ জানতেন যে, তার মৃত্যুও কুফর অবস্থাতেই হবে, তবুও তার নিকট যখন দাওয়াতদাতা প্রেরণ করলেন, তখন নম্র কথা বলার নির্দেশ দিয়েই প্রেরণ করলেন। আজ আমরা যাদেরকে দাওয়াত দেই, তারা ফিরাউনের চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট নয় এবং আমাদের মধ্যে কেউ মূসা ও হারূন (আ)-এর সমতুল্য হিদায়তকারী ও দাওয়াতদাতা নয়। অতএব প্রতিপক্ষকে কটু কথা বলা, বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেওয়া এবং অপমান করার যে অধিকার আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরগণকে দিলেন না, সে অধিকার আমরা কোথা থেকে পেলাম?

কোরআন পাক পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও প্রচার এবং কাফিরদের বিতর্কে পরিপূর্ণ। এতে কোথাও দেখা যায় না যে, আল্লাহ্‌র কোন রসূল সত্যের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনাকারীদের জওয়াবে কোন কটু কথা বলেছেন। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুনঃ

সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকূতে ৫৯ থেকে ৬৭ আয়াত পর্যন্ত দু'জন পয়গম্বর হযরত নূহ ও হযরত হূদ (আ)-এর সাথে তাঁদের সম্প্রদায়ের তর্ক-বিতর্ক এবং গুরুতর অভিযোগের জওয়াবে তারা কি বলেছিলেন, তা লক্ষ্য করার মত।

হযরত নূহ (আ) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার একজন দৃঢ়চেতা পয়গম্বর। সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী তাঁর প্রচারকার্য পরিচালনার কথা সুবিদিত। তিনি সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত স্বজাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র দীনের কথা প্রচার, তাদের সংস্কার ও পথ প্রদর্শনে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু এই হতভাগা জাতির মধ্য থেকে গুণাগুণ্তি কয়েকজন ছাড়া কেউ তাঁর কথার প্রতি কর্ণপাত করেনি। অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং তাঁর এক পুত্র ও স্ত্রী কাফিরদের দলে ভীড়ে যায়। তাঁর স্থলে আজকের কোন দাওয়াত ও সংশোধনের দাবীদার থাকলে অনুমান করুন, এ সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর কথা বলার ভঙ্গি কিরূপ হত। আরও দেখুন, তাঁর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত শুভেচ্ছা ও হিতাকাঙ্ক্ষামূলক দাওয়াতের জওয়াবে সম্প্রদায়ের লোকেরা কি বলল। إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - আমরা তো আপনাকে প্রকাশ্য গোমরাহীতে দেখতে পাচ্ছি।

এদিক থেকে আল্লাহ্‌র পয়গম্বর অবাধ্য জাতির পথভ্রষ্টতা ও দুষ্কর্মের রহস্য উন্মোচন করার পরিবর্তে জওয়াবে কি বলেন দেখুনঃ

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ হে আমার

জাতি! আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। আমি তো বিশ্ব পালনকর্তার তরফ থেকে প্রেরিত রসূল ও দূত। (তোমাদের উপকারের জন্যই আমার সকল প্রচেষ্টা।)

তাঁর পরবর্তী আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় রসূল হযরত হুদ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায় মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও হঠকারিতা করে বলল ঃ আপনি নিজ দাবীর পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করেন নি। আমরা আপনার কথায় আমাদের উপাস্য দেবমূর্তিগুলোকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, আপনি আমাদের উপাস্যদের প্রতি যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন, তার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

হযরত হুদ (আ) এসব কথা শুনে জওয়াব দিলেন ঃ

إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, আমি ঐসব মূর্তি থেকে মুক্ত ও বিমুখ, যেগুলোকে তোমরা আমার আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছ।—(সূরা হুদ)

সূরা আ'রাফে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে বলল ঃ

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ—আমরা তো আপনাকে নির্বোধ মনে করি এবং আমাদের ধারণা এই যে, আপনি একজন মিথ্যাবাদী।

স্বজাতির এ ধরনের পীড়াদায়ক সম্বোধনের জওয়াবে আল্লাহ্‌র রসূল (সা) না তাদের প্রতি কোন বিদ্রূপবাক্য উচ্চারণ করেন এবং না তাদের বিপথগামিতা, মিথ্যা ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণের কোন কথা বলেন; শুধু এতটুকু জওয়াব দেন যে,

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ—হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। আমি তো রাব্বুল 'আলামীনের তরফ থেকে প্রেরিত একজন রসূল।

হযরত শোয়াইব (আ) পয়গম্বরগণের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী স্বজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেন এবং ওজন ও মাপে কম দেওয়ার যে একটি বড় দোষ তাদের মধ্যে ছিল, তা থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দেন। জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তাঁকে অপমানকর সম্বোধন করে বলে ঃ

يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۝

হে শোয়াইব, আপনার নামায কি আপনাকে আদেশ দেয় যে, আমরা বাপদাদার উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করি এবং আমরা যেসব ধনসম্পদের মালিক, সেগুলোতে নিজেদের ইচ্ছামত যা খুশী, তা না করি? বাস্তবিকই আপনি বড় জ্ঞানী ও ধার্মিক!

প্রথমে তো তারা এরূপ ভৎর্সনা করল যে, আপনার নামাযই আপনাকে নির্বুদ্ধিতা শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয় এই যে, ধনসম্পদ আমাদের। এগুলোর লেন-দেন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আপনার অথবা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হস্তক্ষেপ করার অধিকার জন্মায় কিভাবে? বরং এগুলো যদৃচ্ছা ব্যবহার করার অধিকার তো আমাদেরই। তৃতীয় বাক্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে যে, আপনি বড়ই বুদ্ধিমান, বড়ই ধার্মিক।

জানা গেল যে, ধর্মবিবর্জিত অর্থনীতির পূজারি কেবলমাত্র আমাদের এ যুগেই জন্মগ্রহণ করেনি, তাদেরও কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী মনীষী রয়েছে, যাদের মতবাদ তাই ছিল, যা আজকের কতিপয় নামধারী মুসলমান বলছে। তাদের বক্তব্য এই যে, আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম, কিন্তু অর্থনীতিতে আমরা সমকালীন বিজ্ঞানসম্মত পন্থা যথা ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র অনুসরণ করব। এতে ইসলামের কি আসে যায়? মোটকথা, জালিম কওমের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও পীড়াদায়ক বাক্যবাণের জওয়াবে আল্লাহ্‌র রসূল কি বলেন, দেখুন ঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

হে আমার সম্প্রদায়, আচ্ছা বল তো যদি আমি পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর কায়েম থাকি। তিনি আমাকে নিজের পক্ষ থেকে উত্তম ধন অর্থাৎ নবুয়ত দান করে থাকেন। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে তা প্রচার করব না এবং আমি নিজেও তো তোমাদেরকে যা বলি, তার বিরুদ্ধে কাজ করি না। আমি শুধু সংশোধন চাই যতটুকু আমার সাধ্যে রয়েছে। সংশোধন ও কর্মের যে তওফীক আমার হয়, তা একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যে। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং সব ব্যাপারে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

হযরত মূসা (আ)-কে ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নম্র কথা বলার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পুরোপুরি পালিত হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আ)-র সাথে ফিরাউনের সম্বোধন ছিল এরূপ ঃ

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

ফিরাউন বলল ঃ আমরা কি শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করিনি ? তুমি বছরের পর বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ এবং তুমি এমন কাণ্ড করেছিলে, যা করছিলে। (অর্থাৎ কিবতীকে হত্যা করেছিলে) তুমি বড় অকৃতজ্ঞ !

এতে মূসা (আ)-র কাছে এ অনুগ্রহও প্রকাশ করেছে যে, আমরা শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করেছি। বড় হয়ে যাওয়ার পরও বেশ অনেক দিন তুমি আমাদের কাছে অবস্থান করেছ। মূসা (আ)-র হাতে জনৈক কিবতী অনিচ্ছাকৃতভাবে নিহত হয়েছিল। ফিরাউন সে ঘটনার কথা উল্লেখ করে স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এ কথাও বলেছে যে, তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ।

এখানে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞও হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো তোমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছি, কিন্তু তুমি আমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। এটা অকৃতজ্ঞতা। ফিরাউনের বক্তব্য পারিভাষিক অর্থেও হতে পারে। কেননা, ফিরাউন স্বয়ং খোদায়ী দাবী করত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার খোদায়ী অস্বীকার করত, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি তো কাফিরই হয়ে যেতো !

এখন এস্থলে হযরত মূসা (আ)-র জওয়াব শুনুন, যা পয়গম্বরসুলভ নীতি-নিয়ম এবং চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে সর্বপ্রথম তিনি নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতা স্বীকার করে নেন ; অর্থাৎ এক সময় তিনি জনৈক ইসরাঈলী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণরত জনৈক কিবতীকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে একটি ঘুষি মেরেছিলেন। ফলে তার প্রাণ-বায়ু বের হয়ে যায়। এ হত্যাকাণ্ড যদিও মূসার ইচ্ছাকৃত ছিল না, কিন্তু এর পক্ষে কোন ধর্মীয় তাগিদও ছিল না। মূসা (আ)-র শরীয়তের আইনেও কিবতী হত্যাযোগ্য ছিল না। তাই প্রথমে স্বীকার করেন যে, فَعَلْتُهَا إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ

অর্থাৎ আমি একাজটি তখন করেছিলাম, যখন আমি অবোধ ছিলাম।—(সূরা শু'আরা)

উদ্দেশ্য এই যে, এ কাজটি নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ঘটে গিয়েছিল। তখন এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ আমার জানা ছিল না। এরপর বলেন ঃ

فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

এরপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। অতঃপর আমার পালনকর্তা আমাকে বুদ্ধিমত্তা দান করলেন এবং আমাকে পয়গম্বরগণের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।—(সূরা শু'আরা)

অতঃপর ফিরাউনের অনুগ্রহ প্রকাশের উত্তরে বললেন যে, তোমার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা যথার্থ নয়। কেননা, আমার লালন-পালনের ব্যাপারটি তোমারই জুলুম ও উৎপীড়নের ফলশ্রুতি ছিল। তুমি ইসরাঈল বংশের ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যার আদেশ জারি করে রেখেছিলে। তাই আমার জননী বাধ্য হয়ে আমাকে নদীতে নিক্ষেপ করেন

এবং তোমার গৃহে পৌঁছার ঘটনা ঘটে। বলেছেন ঃ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ— (আমাকে লালন-পালন করার) যে নিয়ামতের ঋণভার তুমি আমার উপর রাখছ, তার কারণ এই যে তুমি ইসরাঈল বংশীয়দেরকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করে রেখেছিলে।

এরপর ফিরাউন যখন প্রশ্ন করল ঃ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ বিশ্বপালক কে এবং কি? তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ তিনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর পালনকর্তা। এতে ফিরাউন বিদ্রূপের স্বরে উপস্থিত লোকদেরকে বলল ঃ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ——অর্থাৎ তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না সে কিরূপ বোকার মত কথাবার্তা বলে যাচ্ছে? তখন মূসা (আ) বললেন ঃ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ তোমাদের এবং তোমাদের বাপদাদাদেরও তিনিই পালনকর্তা রব।

ফিরাউন বিরক্ত হয়ে বলল ঃ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

অর্থাৎ এই ব্যক্তি যে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল হওয়ার দাবী করছে, সে বদ্ধ পাগল।

পাগল উপাধি দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের পাগলামি এবং নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করার পরিবর্তে মূসা (আ) সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি; বরং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের আরও একটি গুণ প্রকাশ করে বললেন ঃ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ——তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বুঝ!---(সূরা শু'আরা)

সূরা শু'আরার তিন রুকূতে পরিব্যাপ্ত এটি হচ্ছে হযরত মূসা (আ) ও ফিরাউনের মধ্যকার ফিরাউনের দরবারে অনুষ্ঠিত একটি দীর্ঘ কথোপকথন। আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল মূসা (আ)-র এই কথোপকথনটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন; এতে না কোন ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, না কটু কথার জওয়াব আছে এবং না তার কটু কথার জওয়াবে কোন কটুকথা বলা হয়েছে; বরং আগা-গোড়া আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ঐ প্রচার কাজ ব্যক্ত হয়েছে।

এ হচ্ছে একগুঁয়ে ও হঠকারী সম্প্রদায়ের সাথে পয়গম্বরগণের তর্ক-বিতর্কের সংক্ষিপ্ত নমুনা এবং এ হচ্ছে কোরআন বর্ণিত উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্কের বাস্তব ব্যাখ্যা।

তর্ক-বিতর্ক ছাড়া দাওয়াত ও প্রচারের কাজে পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ব্যক্তি ও স্থানোপযোগী কথা বলার ব্যাপারে যে সব বিজ্ঞজনোচিত নীতি, ভঙ্গি, হিকমত ও উপযোগিতার

প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন এবং দাওয়াতকে জনপ্রিয়, কার্যকরী ও স্থায়ী করার জন্য যেসব কর্ম-পন্থা গ্রহণ করেছেন, সেগুলোই আসলে দাওয়াতের প্রাণ। এর বিস্তারিত বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমগ্র শিক্ষার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। নমুনা হিসাবে কয়েকটি বিষয় দেখুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াত, প্রচার ও ওয়াজ-নসীহতে শ্রোতাদের উপর যাতে বোঝা না চাপে, সেদিকে খুব খেয়াল রাখতেন। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তাঁর আশিক। তাঁরা তাঁর কথা-বার্তা শুনে বিরক্তিবোধ করবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তাঁদের বেলায়ও তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, প্রত্যহ ওয়াজ-নসীহত করতেন না—সপ্তাহের কোন কোন দিন করতেন, যাতে শ্রোতাদের কাজ-কারবারে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এবং তাদের মনের উপর বোঝা না চাপে।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মসঊদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তাহের কোন কোন দিনই ওয়াজ করতেন, যাতে আমরা বিরক্ত না হয়ে পড়ি। তিনি অন্যান্যদেরকেও এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا—সহজ কর, কঠিন করো না। মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমতের সুসংবাদ শোনাও, নিরাশ কিংবা পালিয়ে যেতে বাধ্য করো না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন : তোমাদের রব্বানী দার্শনিক আলিম ও ফকীহ্ হওয়া উচিত। সহীহ্ বুখারীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে 'রব্বানী' শব্দের তফসীর করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রচার ও শিক্ষাদানে লালন-পালনের নীতি অনুযায়ী প্রথমে সহজ সহজ বিষয় বর্ণনা করে, অতঃপর লোকেরা এসব বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অন্যান্য কঠিন বিষয় বর্ণনা করে, তাকে 'আলিমে-রাব্বানী' বলা হয়। আজকাল ওয়াজ ও প্রচারের প্রভাব খুব কম প্রতিফলিত হয়। এর বড় কারণ এই যে, সাধারণত এ কাজে যারা ব্রতী, তারা এসব নীতি-রীতির প্রতি বড় একটা লক্ষ্য রাখে না। সুদীর্ঘ বক্তৃতা সময়ে-অসময়ে উপদেশ, প্রতিপক্ষের অবস্থা জানা ব্যতিরেকেই তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াত ও সংশোধনের কাজে এ দিকটির প্রতিও সযত্ন লক্ষ্য রাখতেন যে, প্রতিপক্ষ যেন লজ্জিত ও অপমানিত না হয়। এ জন্যই যখন কোন ব্যক্তিকে কোন ভুল মন্দ কাজে লিপ্ত দেখতেন, তখন তাকে সরাসরি সম্বোধন করার পরিবর্তে উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বলতেন : ما بال اقوام يفعلون كذا—লোকদের কি হয়েছে যে, তারা অমুক কাজ করে ?

এই ব্যাপক সম্বোধনে যাকে শোনানো আসল লক্ষ্য হত, সে-ও শুনে নিত এবং মনে মনে লজ্জিত হয়ে সংশ্লিষ্ট কাজটি পরিত্যাগ করতে যত্নবান হতো।

প্রতিপক্ষকে লজ্জা থেকে বাঁচানোই ছিল পয়গম্বরগণের সাধারণ অভ্যাস। এ কারণেই তাঁরা মাঝে মাঝে প্রতিপক্ষের কাজকে নিজের কাজ বলে প্রকাশ করে সংশোধনের চেষ্টা করতেন। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে :

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ---অর্থাৎ আমার কি হল যে, আমি আমার সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করব না? বলা বাহুল্য, রসূলের এ দূতটি সদাসর্বদাই ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তবে যে প্রতিপক্ষ ইবাদতে মশগুল ছিল না, তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি কাজটিকে নিজের কাজ বলে জাহির করেছেন।

দাওয়াতের অর্থ অপরকে নিজের কাছে ডাকা---শুধু তার দোষ বর্ণনা করা নয়। এ ডাকা তখনই হতে পারে, যখন বক্তা ও তার সম্বোধিতদের মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকে। এজন্যই কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের দাওয়াতের শিরোনাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا قَوْمِ বলে শুরু করা হয়েছে। এতে ভ্রাতৃসুলভ অভিন্নতা প্রথমে প্রকাশ করে পরে সংশোধনমূলক কথা-বার্তা বলা হয়। অর্থাৎ আমরা তো একই সমাজভুক্ত লোক। কাজেই একের মনে অন্যের প্রতি কোনরূপ ঘৃণা থাকা উচিত নয়। এ কথা বলে পয়গম্বরগণ সংশোধনের কাজ আরম্ভ করেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াতের যে চিঠি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, তাতে প্রথমে রোম সম্রাটকে عظيم الروم (রোমের মহান আধিপতি) উপাধিতে ভূষিত করেন। এতে তার বৈধ সম্মান রয়েছে। কেননা, এতে মহান হওয়ার স্বীকারোক্তিও আছে, কিন্তু রোমকদের জন্য---নিজের জন্য নয়। অতঃপর নিম্নোক্ত ভাষায় তাকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হয়ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! আহবানের প্রতিটি বাক্যের দিকে এস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করব না।
---(সূরা আলে ইমরান)

এতে প্রথমে পারস্পরিক ঐক্যের একটি অভিন্ন কেন্দ্রবিন্দু উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো এই যে, একত্ববাদের বিশ্বাস আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। এরপর খৃস্টানদের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলে প্রত্যেক শিক্ষা ও দাওয়াতের মধ্যে এমনি ধরনের আদব ও নীতি পাওয়া যাবে। আজকাল প্রথমে তো দাওয়াত ও সংশোধন এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি লক্ষ্যই করা হয় না। যারা এ কাজে নিয়োজিত তারা শুধু তর্কবিতর্ক, বিপক্ষের প্রতি দোষারোপ, বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত করাকেই দাওয়াত ও প্রচার মনে করে নিয়েছে। এটা সুন্নতবিরোধী হওয়ার কারণে কখনও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় না। তারা মনে করতে থাকে যে, তারা

ইসলামের জন্য খুব কাজ করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা লোকদেরকে ইসলাম থেকে বিমুখ করার কারণ হচ্ছে।

প্রচলিত তর্ক-বিতর্কের ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট ঃ আলোচ্য আয়াতের তফসীরে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শরীয়তের আসল উদ্দেশ্য হল দাওয়াত। এর দু'টি মূলনীতি—হিকমত ও উত্তম উপদেশ। যদি কখনও তর্ক-বিতর্কে জড়িত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে اَحْسَن তথা উত্তম পন্থার শর্তসাপেক্ষে তারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে দাওয়াতের কোন পন্থা নয়; বরং এর নেতিবাচক দিকের একটি কৌশল মাত্র। এতে কোরআন পাক بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ -এর শর্ত লাগিয়ে যেমন ব্যক্ত করেছে যে, এটা নম্রতা, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে করা উচিত, এতে প্রতিপক্ষের অবস্থা অনুযায়ী সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং প্রতিপক্ষের অপমান ও ঘৃণা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা উচিত, তেমনি স্বয়ং বক্তার জন্য ক্ষতিকর না হওয়াও এর উৎকর্ষের জন্য জরুরী। অর্থাৎ বক্তার মধ্যে চরিত্রহীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, আড়ম্বরপ্রীতি ইত্যাদি দোষ সৃষ্টি না হওয়া উচিত। এগুলো কঠিন আত্মিক পাপ। আজকালকার আলোচনা ও বিতর্কযুদ্ধে ঘটনাক্রমে আল্লাহ্‌র কোন বান্দা এগুলো থেকে মুক্ত থাকলে থাকতেও পারে। নতুবা স্বভাবত এগুলো থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন।

ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ মদ যেমন যাবতীয় দুষ্কর্মের মূল—নিজেও মহাপাপ এবং অন্যান্য বড় বড় দৈহিক পাপের উপায়ও বটে, তেমনি তর্ক-বিতর্কে প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য লাভ এবং মানুষের কাছে স্বীয় শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য হলে এটা যাবতীয় আধ্যাত্মিক দোষের মূল। এর ফলে অনেক আত্মিক অপরাধ জন্মলাভ করে। উদাহরণত হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, পরনিন্দা, অপরের ছিদ্রান্বেষণ, পরশ্রীকাতরতা, সত্যগ্রহণে অনীহা, অন্যের উক্তি নিয়ে ন্যায় পথে চিন্তা করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করতে হলেও তা করতে দ্বিধান্বিত না হওয়া।

এসব মারাত্মক দোষে মর্যাদাসম্পন্ন আলিমগণও লিপ্ত হন। কিন্তু ব্যাপারটি যখন তাদের অনুসারীদের কাছে পৌঁছে, তখন ধস্তাধস্তি, মারামারি ও লড়াইয়ের বাজার গরম হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহ ... ...।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ

জ্ঞান হচ্ছে শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এখন যারা জ্ঞানকেই শত্রুতার রূপ দান করছে, তারা বিজাতিকে নিজেদের ধর্ম অনুসরণের দাওয়াত কিভাবে দিতে পারে! অন্যদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করাই যখন তাদের লক্ষ্য তখন তাদের কাছ থেকে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভালবাসা ও মানবতাবোধের কল্পনা কেমন করে করা যেতে পারে? একজন মানুষের জন্য এর চাইতে বড় অনিষ্ট আর কি হতে পারে যে, তাকে ঈমানদার ও পরহিযগারের চরিত্র থেকে বঞ্চিত করে মুনাফিকের চরিত্রে রূপান্তরিত করে দেয়।

ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ ধর্মীয় শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে ব্রতী ব্যক্তি হয় নির্ভুল নীতি অনুসরণ করে এবং মারাত্মক বিপদ থেকে বিরত থেকে চিরন্তন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যায়, না হয় এ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে সীমাহীন দুর্ভাগ্যের দিকে ধাবিত হয়। মধ্যস্থলে অবস্থান করা তার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, যে শিক্ষা উপকারী হয় না, তা আযাব বৈ কিছু নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ---কিয়ামতের দিন সর্বাধিক কঠোর আযাবে সে আলিম ব্যক্তি পতিত হবে, যার ইল্‌ম দ্বারা আল্লাহ্ তাকে কোন উপকার দেন নি।

অন্য এক সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ

لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس اليكم فمن فعل ذلك فهو في النار -

ধর্মীয় শিক্ষা এ উদ্দেশ্যে অর্জন করো না যে, তার মাধ্যমে অন্য আলিমদের মোকাবিলায় গৌরব ও সম্মান অর্জন করবে কিংবা স্বল্প শিক্ষিতদের সাথে ঝগড়া করবে অথবা এর মাধ্যমে অন্যের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। যে এরূপ করে, সে জাহান্নামে যাবে।---(ইবনে মাজা)

এ কারণেই ফিকাহ্‌শাস্ত্রের ইমামগণ ও সত্যপন্থী মনীষীবৃন্দ শিক্ষণীয় ব্যাপারাদিতে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক কোন কালেই জায়েয মনে করতেন না। দাওয়াতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত মনে কর, তাকে নম্রতা ও শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। এরপর সে গ্রহণ করে নিলে উত্তম। নতুবা চুপ থাক এবং ঝগড়া কটুকথা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাক। হযরত ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ

كان مالك يقول المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد وقيل له رجل له علم بالسنة فهل يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فان قبل منه والا سكت -

ইল্‌ম সম্পর্কে ঝগড়া ও বিতর্ক, ইল্‌মের ঔজ্জ্বল্যকে মানুষের অন্তর থেকে নিঃশেষ করে দেয়। কেউ বলল ঃ এক ব্যক্তি সুন্নাহ্‌র শিক্ষায় শিক্ষিত। সে কি সুন্নাহ্‌র হিফাযতের জন্য তর্ক করতে পারে? তিনি বললেন ঃ না, তার উচিত প্রতিপক্ষকে বিশুদ্ধ কথাটি বলে দেওয়া। এরপর যদি সে গ্রহণ করে, তবে উত্তম। নতুবা সে চুপ থাকবে।---(আওজাযুল মাসালেক শরহে মুয়াত্তা মালেক, ১ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

বর্তমান যুগে দাওয়াত ও সংস্কার প্রচেষ্টা পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ার কারণ দ্বিবিধ।

এক. যুগের অধঃপতন ও হারাম বস্তুসমূহের আধিক্যের কারণে সাধারণভাবে মানুষের অন্তর কঠোর ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেছে এবং সত্য গ্রহণের তওফীক

হ্রাস পেয়েছে। কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সে গজবে পতিত রয়েছে, যার সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা) দিয়েছিলেন যে, শেষ যমানায় অধিকাংশ মানুষের অন্তর অধোমুখী হয়ে যাবে এবং ভাল-মন্দের পরিচয় এবং জায়েয-নাজায়েযের পার্থক্য তাদের অন্তর থেকে উঠে যাবে।

দুই. সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং দাওয়াতের কর্তব্যের প্রতি অমনোযোগিতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সর্বসাধারণের কথা না-ই বললাম, আলিম ও সজ্জনদের মধ্যেও এ প্রয়োজনের অনুভূতি খুবই কম। এটা বুঝে নেওয়া হয়েছে যে, নিজের কাজকর্ম সংশোধন করতে পারলেই যথেষ্ট। তাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই, বন্ধু-বান্ধব যত গোনাহেই লিপ্ত থাকুক না কেন, তাদের সংশোধনের চিন্তা যেন তাদের দায়িত্বই নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাক্যাবলী প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্বে তার পরিবার-পরিজন ও সংশ্লিষ্টদের সংশোধন প্রচেষ্টা ফরয করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যদি কিছু সংখ্যক লোক দাওয়াত ও সংশোধনের কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়ও, তবে তারা কোরআনের শিক্ষা এবং পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যাকে যখন ইচ্ছা বলে দেয় এবং ধরে নেয়, তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে ফেলেছে। অথচ এ কর্মপদ্ধতি পয়গম্বরগণের সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে মানুষকে ধর্ম ও ধর্মের বিধানাবলী পালন থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করে দেয়।

বিশেষ করে যেখানে অপরের সমালোচনা করা হয়, সেখানে সমালোচনার আড়ালে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ পর্যন্ত করা হয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ

যে ব্যক্তিকে তার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে হয়, সে বিষয়টা যদি তুমি তাকে নির্জনে নম্রভাবে বুঝিয়ে দাও, তবে তা হবে উপদেশ। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ্যভাবে জনসমক্ষে তাকে লজ্জা দাও, তবে তাই হবে তাকে অপদস্থ করা।

আজকাল অপরের দোষত্রুটির ব্যাপারে পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরাকে দীনের কাজ মনে করে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে দীন ও দীনের দাওয়াতের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং নীতি অনুযায়ী দীনের কাজ করার তওফীক দান করুন।

এ পর্যন্ত দাওয়াতের নীতি ও আদব বর্ণিত হল। এরপর বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ —এ

বাক্যটি দীনের প্রতি দাওয়াতদাতাদের সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে। কেননা, পূর্বোল্লিখিত নীতি ও আদবের অনুসরণ সত্ত্বেও যখন প্রতিপক্ষ সত্য গ্রহণ না করে, তখন স্বভাবত মানুষ দারুণ ব্যথা অনুভব করে এবং মাঝে মাঝে এর এমন প্রতিক্রিয়াও হতে পারে যে, দাওয়াতের কোন উপকার না দেখে দাওয়াতদাতা নিরাশ হয়ে তা বর্জনও করে বসতে পারে। তাই এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু নির্ভুল নীতি অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করে

যাওয়া। দাওয়াত কবুল করা বা না করা, এতে আপনার কোন দখল নেই এবং এটা আপনার দায়িত্বও নয়। এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। তিনিই জানেন, কে পথভ্রষ্ট থাকবে এবং কে সুপথ প্রাপ্ত হবে। আপনি এ চিন্তায় পড়বেন না। নিজের কাজ করে যান। সাহস হারাবেন না এবং নিরাশ হবেন না। এতে বোঝা গেল যে, এ বাক্যটিও দাওয়াতের আদবেরই পরিশিষ্ট।

দাওয়াতদাতাকে কেউ কষ্ট দিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয, কিন্তু সবর করা উত্তম ঃ বিগত আয়াতের পরবর্তী তিন আয়াতে দাওয়াতদাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন কঠোর-প্রাণ মূর্খদের সাথেও পালা পড়ে যায় যে, তাদেরকে যতই নম্রতা ও শুভেচ্ছা সহকারে বোঝানো হোক না কেন, তারা উত্তেজিত হয়ে যায় কটুকথা বলে কষ্ট দেয় এবং কোন কোন সময় আরও বাড়াবাড়ি করে দাওয়াতদাতাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়, এমনকি তাদেরকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমতাবস্থায় দাওয়াতদাতাদের কি করা উচিত ?

এ সম্পর্কে وَإِنْ عَاقَبْتُمْ الخ বাক্যে প্রথমত তাদেরকে আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে ; বেশি হতে পারবে না।

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে কিন্তু সবর করা উত্তম।

আয়াতের শানে নুযুল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত হামযা (রা)-কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত তদ্রূপই। দারা-কুতুনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে ঃ

ওহুদের যুদ্ধ-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তর জন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রা)-র মৃতদেহও ছিল। তাঁর প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল। তাই তাঁকে হত্যা করার পর মনের ঝাল মিটাতে গিয়ে তাঁর নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে এবং পেট চিরে দিয়েছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য وَإِنْ عَاقَبْتُمْ শীর্ষক তিনটি আয়াত নাযিল হয়েছে।---(তফসীর কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফিররা অন্যান্য সাহাবীর মৃতদেহও বিকৃত করেছিল।—(তিরমিযী, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান)

এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা) সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তর জন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহ্র কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণেই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর জনের উপর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ন্যায়ানুগ আচরণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয়।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এখন আমরা সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না। এরপর তিনি কসমের কাফফারা আদায় করে দেন। ---(মাযহারী)

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের হস্তগত হয়, তখন ওহুদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার এটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ই রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বারবার নাযিল হয়েছে। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে। —(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত-পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেওয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোন মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে।—(জাস্সাস)

মাস'আলা ঃ আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একারণেই ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারও অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে

সেই পরিমাণ অর্থসম্পদ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থ-সম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণত নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে। খাদ্যশস্য, বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্যশস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য প্রকার সামগ্রী নিতে পারবে না। উদাহরণত টাকা-পয়সার বিনিময়ে বস্ত্র অথবা অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন---এক প্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাস'আলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহ্‌গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ---আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব মুসলমানের জন্য সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয় বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে ঃ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

---অর্থাৎ আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না---সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহ্‌র সাহায্যে হবে। অর্থাৎ সবর করা আপনার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে।

শেষ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য অর্জিত হওয়ার একটি সাধারণ কায়দা বলে দেওয়া হয়েছে যে,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ---এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণান্বিত। এক. তাকওয়া, ইহসান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহ্‌সানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ যারা শরীয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গ (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার?

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا

সূরা বনী ইসরাঈল

মক্কায় অবতীর্ণ ॥ ১১১ আয়াত, ১২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

পরম মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত---যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি---যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পবিত্র সে সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ (সা)-কে রাত্রিবেলায় সফর করিয়েছেন মসজিদে হারাম (অর্থাৎ কাবার মসজিদ) থেকে মসজিদে-আকসা (অর্থাৎ বায়তুল-মুকাদ্দাস) পর্যন্ত যার আশেপাশে (এ ফিলিস্তীনে) আমি (ধর্মীয় ও পার্থিব) বরকতসমূহ রেখেছি। (ধর্মীয় বরকত এই যে, সেখানে বহু সংখ্যক পয়গম্বর সমাহিত রয়েছেন এবং পার্থিব বরকত এই যে, সেখানে বাগ-বাগিচা, নদ-নদী, ঝরণা ও ফসলের প্রাচুর্য রয়েছে। মোটকথা, সে মসজিদ পর্যন্ত বিস্ময়করভাবে এজন্য) নিয়ে গেছি, যাতে আমি তাঁকে স্বীয় কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। (তন্মধ্যে কিছু সংখ্যকের সম্পর্ক তো স্বয়ং সে জায়গার সাথেঃ উদাহরণত এত দীর্ঘ পথ খুব অল্প সময়ে অতিক্রম করা, সব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত করা এবং তাঁদের কথাবার্তা শোনা ইত্যাদি এবং কিছু সংখ্যকের সম্পর্ক পরবর্তী পর্যায়ের সাথে। যেমন, আকাশে যাওয়া এবং সেখানকার অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করা।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (যেহেতু তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথা শুনতেন এবং অবস্থা দেখতেন, তাই তাঁকে এতদসম্পৃক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সম্মান দান করেছেন এবং এমন নৈকট্য দিয়েছেন, যা কেউ লাভ করেনি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা আমাদের রসূল (সা)-এর একটি বিশেষ সম্মান ও স্বাতন্ত্র্যমূলক মু'জিযা। اسراء শব্দটি أسرى ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর لَيْلًا শব্দটি স্পষ্টত এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। ذكر ৪ শব্দটি لَيْلًا ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মি'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মি'রাজ সূরা নজমে উল্লিখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে بِعَبْدِهٖ ৪ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্য আর হতে পারে না। হযরত হাসান দেহ্লভী চমৎকার বলেছেন ঃ

بندۂ حسن بصد زبان گفت کہ بندۂ توام
تو بزبان خود بگو بندۂ نواز کیستی

অর্থ ঃ তোমার বান্দা হাসান তো শত মুখে বলে থাকে যে, আমি তোমার বান্দা; তুমি তোমার নিজের মুখে একবার বলনা যে, আমি তোমারই দাস !!

আল্লাহ্র তরফ থেকে বান্দাদের প্রতি এরূপ সম্বোধন একটা অতুলনীয় মর্যাদা। যেমন অন্য এক আয়াতে عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ বলে স্বীয় মকবুল বান্দাদের সম্মান বৃদ্ধি করা লক্ষ্য রয়েছে। এতে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বান্দা হয়ে যাওয়াই মানুষের সর্ববৃহৎ গুণ। কেননা, বিশেষ সম্মানের স্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনেক গুণের মধ্য থেকে দাসত্ব গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা আরও একটি বড় উপকার সাধন লক্ষ্য। তা এই যে, আগাগোড়া অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ এই সফর থেকে কারও মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয়ে যায় যে, এ অলৌকিক ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণের ব্যাপারটি একটি আল্লাহ্র গুণের অংশবিশেষ। যেমন ঈসা (আ)-র আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে খৃস্টান জাতি ধোঁকায় পড়েছে। তাই عبد (বান্দা) শব্দ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এসব গুণ, চরম পরাকাষ্ঠা ও মু'জিযা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র বান্দাই—স্বয়ং আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র কোন অংশীদার নন।

কোরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মি'রাজের প্রমাণাদি ও ইজমা ঃ ইসরা ও মি'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মত দৈহিক

ছিল, একথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحٰنَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হত তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

بِعَبْدِهٖ শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রা)-র কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফিররা আপনার প্রতি আরও বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফিররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোন আত্মিক মি'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থী নয় وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মতে رُؤْيَا (স্বপ্ন) বলে رُؤْيَت (দেখা) বোঝানো হয়েছে, কিন্তু একে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رُؤْيَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رُؤْيَا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেওয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ, মিরাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে যে স্বপ্নযোগে মি'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মি'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী আয়ায শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। নামগুলো এই ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব আলী মর্তুজা, ইবনে মসউদ, আবু যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ,

ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্য, আবূ হাইয়্যা, আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবূ আইউব আনসারী, আবূ উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)।

এরপর ইবনে কাসীর বলেন ঃ فحديث الاسراء اجمع عليه المسلمون واعرض عنه الزنادقة والملحدون সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি।

মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে কাসীরের রেওয়ায়েত থেকে

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন ঃ সত্য কথা এই যে, নবী করীম (সা) ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নিচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। ইদানিং কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে। এই আলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাঁদের অবস্থান কোন নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণত ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল মুন্‌তাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজাপতি ইতস্তত ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের রফরফ দেখতে পান। সবুজ রঙের গদি বিশিষ্ট পাল্কীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মূরও দেখেন। বায়তুল-মা'মূরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মা'মূরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বচক্ষে জান্নাত ও দোযখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা সব ইবাদতের মধ্যে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাযের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে নামায আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাযও হতে পারে। ইবনে কাসীর বলেন ঃ নামাযে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যত এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল সব পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই এ কাজটি প্রথমে সেরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্য তাঁর সাথে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিবরাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবার ইমাম বানিয়ে কার্যত তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতে থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌঁছে যান।

واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য ঃ তফসীর ইবনে কাসীরে বল হয়েছে ঃ হাফেয আবূ নায়ীম ইস্পাহানী দালায়েলুন্নবুওয়ত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর (১) সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুর্যীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ

"রসূলুল্লাহ্ (সা) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহ্ইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহইয়ার পত্র পৌঁছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ্ বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছুসংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফিলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বুখারী মুসলিম

---

(১) ওয়াকেদীকে হাদীস বর্ণনায় হাদীসবিদগণ দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে কাসীরের মত সাবধানী মুহাদ্দিস তাঁর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কারণ, ব্যাপারটি আকীদা কিংবা হালাল-হারামের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এ ধরনের ঐতিহাসিক ব্যাপারে তাঁর রেওয়ায়েত ধর্তব্য।

প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবূ সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবূ সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটিমাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় পতিপন্ন হব এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নেবেন। আমি বললাম ঃ আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবূ সুফিয়ান বলল ঃ নবুয়তের এই দাবীদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং সে রাত্রেই প্রত্যূষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ার (বায়তুল মোকাদ্দাসের) সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল ঃ আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না)। মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারক হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল ঃ কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোন জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবত একারণে বন্ধ হতে দেননি যে, কোন নবী এখানে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাত্রে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।---(ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ)

ইসরা ও মি'রাজের তারিখ ঃ ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয় মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহ্রী বলেন ঃ হযরত খাদীজা (রা.)-র ওফাত নবুয়তপ্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, মি'রাজের ঘটনা নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন ঃ মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মি'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হরবী বলেন ঃ ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭ তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন ঃ নবুয়তপ্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন নি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭তম রাত্রি মি'রাজের রাত্রি। والله سبحانه اعلم

মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা ঃ হযরত আবূযর গিফারী (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ মসজিদে **হারাম**। অতঃপর আমি আরয করলাম ঃ এরপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কত দিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন ঃ এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ে নাও।---(মুসলিম)

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্‌র স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তি স্তর সপ্তম যমীনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আ) নির্মাণ করেছেন। ---(নাসায়ী, তফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃ, ৪র্থ খণ্ড)

বায়তুল্লাহ্‌র চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেওয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়ায়েতের এ বৈপরিত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ঈসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেওয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়। والله اعلم

মসজিদে আকসা ও সিরিয়ার বরকত ঃ আয়াতে بَارَكْنَا حَوْلَهُ বলা হয়েছে। এখানে حول বলে সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা আরশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূ-পৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন।---(রূহুল মা'আনী)

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধঃ ধর্মীয় ঐ জাগতিক। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূ-ভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রেওয়ায়েতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! শহরসমূহের মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব। ---(কুরতুবী) মসনদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না---(১) মদীনার মসজিদ (২) মক্কার মসজিদ (৩) মসজিদে আকসা এবং (৪) মসজিদে তূর।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

(২) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়েতে পরিণত করেছি যে, তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে কার্যনির্বাহী স্থির করো না। (৩) তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মূসা (আ)-কে (তওরাত) গ্রন্থ দিয়েছি এবং আমি সেটিকে বনী-ইসরাঈলের জন্য হিদায়েত (অর্থাৎ হিদায়তের উপায়) করেছি (তাতে অন্যান্য বিধানসহ তওহীদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানও ছিল) যে, তোমরা আমাকে ছাড়া (নিজেদের) কোন কার্যনির্বাহী স্থির করো না। হে সেই সব লোকের বংশধরেরা; যাদেরকে আমি নূহ (আ)-র সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, (আমি তোমাদেরকে বলছি, যাতে সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করে। আমি যদি তাদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে রক্ষা না করতাম, তবে কিরূপে আজ তোমরা তাদের বংশধর হতে? নিয়ামতটি স্মরণ করে তার শোকর কর এবং শোকরের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তওহীদ। আর নূহ (আ) খুবই শোকর-গুযার বান্দা ছিলেন। (সুতরাং পয়গম্বরগণ যখন শোকর করেছেন, তখন তোমরা তা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পার)?

وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ
وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ
وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ لِيَسُۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ
وَلِيَدْخُلُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا۟ مَا عَلَوْا
تَتْبِيرًا ۝ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَٰفِرِينَ حَصِيرًا ۝

(৪) আমি বনী-ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। (৫) অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (৬) অতঃপর আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। (৭) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকে ছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংস যজ্ঞ চালায়। (৮) হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য কয়েদখানা করেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি বনী-ইসরাঈলকে (তওরাত অথবা ইসরাঈল বংশীয় অন্যান্য পয়গম্বরের সহীফা) গ্রন্থে একথা (ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে) বলে দিয়েছিলাম, যে তোমরা (শাম) দেশে দু'বার (প্রচুর গোনাহ্ করে) অনর্থ সৃষ্টি করবে [একবার মূসা (আ)-র শরীয়তের বিরোধিতা করে।] এবং অন্যদের উপরও খুব বল প্রয়োগ করতে থাকবে (অর্থাৎ অত্যাচার-উৎপীড়ন করবে لَتُفْسِدُنَّ বলে আল্লাহ্র হক নষ্ট করার প্রতি এবং لَتَعْلُنَّ বলে বান্দার হক নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, উভয়বার তোমরা ভীষণ আযাবে পতিত হবে)। অতঃপর যখন প্রথমবারের ওয়াদা আসবে, তখন আমি তোমাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেব, যারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় হবে। অতঃপর তারা (তোমাদের) গৃহসমূহে প্রবেশ করবে (এবং তোমাদেরকে হত্যা, বন্দী ও লুটতরাজ করবে)। এটা (শাস্তির এমন) এক ওয়াদা, যা অবশ্যই পূর্ণ হবে। অতঃপর (যখন তোমরা স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং তওবা করবে, তখন) আমি পুনরায় ওদের উপর তোমাদেরকে প্রাধান্য দান করব (যদিও তা হবে পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ যে জাতি তাদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করবে, তারা তোমাদের মিত্র হয়ে যাবে)। এভাবে তোমাদের শত্রু সে জাতির কাছে এবং তোমাদের কাছে পরাভূত হয়ে যাবে। এবং অর্থসম্পদ ও পুত্র-সন্তান দ্বারা (যেগুলো বন্দী ও লুট করা হয়েছিল) আমি তোমাদের সাহায্য করব অর্থাৎ এসব বস্তু-সামগ্রী তোমরা ফেরত পেয়ে যাবে। ফলে তোমরা শক্তিশালী হবে এবং আমি তোমাদের দল (অর্থাৎ অনুসারীদের)-কে বৃদ্ধি করব। (সুতরাং জাঁক-জমক, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও অনুসারী সব কিছুতেই উন্নতি হবে। আর সে গ্রন্থে এ উপদেশও লিখেছিলাম যে) যদি (ভবিষ্যতে) ভাল কাজ কর, তবে নিজেদের উপকারার্থেই তা করবে (অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে এর উপকার পাবে) এবং যদি (পুনরায়) তোমরা মন্দ কাজ কর তবে, তাও নিজেদের জন্যই করবে। (অর্থাৎ আবার শাস্তি ভোগ করবে। সেমতে তাই হয়েছে। যেমন, অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে) এরপর যখন (উপরোক্ত দু'বার অনর্থ সৃষ্টির মধ্য থেকে) শেষবারের সময় আসবে [তখন তোমরা ঈসা (আ)-র শরীয়তের বিরোধিতা করবে] তখন আমি পুনরায় তোমাদের উপর অপরকে জয়ী করে দেব, যাতে (তারা পিটিয়ে) তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয় এবং যেভাবে তারা (পূর্ববর্তী লোকেরা বায়তুল মোকাদ্দাসের) মসজিদে (লুটতরাজ করতে করতে) ঢুকেছিল, এরাও (অর্থাৎ পরবর্তী লোকেরাও) তাতে ঢুকে পড়বে এবং যে বস্তু তাদের হস্তগত হবে সেগুলোকে (ধ্বংস ও) বরবাদ করে দেবে। [এবং সে গ্রন্থে একথাও লিখেছিলাম যে, এই দ্বিতীয়বারের পর যখন মুহাম্মদ (সা)-এর আমল আসবে, তখন তোমরা বিরোধিতা ও অবাধ্যতা না করে তাঁর শরীয়তের অনুসরণ কর। তাতে] আশ্চর্য নয় (অর্থাৎ ওয়াদার অর্থে আশা রয়েছে) যে, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি রহমত করবেন (এবং তোমাদেরকে পুনরায় অপমানের হাত থেকে মুক্তি দেবেন) এবং যদি তোমরা পুনরায় সে (অপ) কর্ম কর, তবে আমিও পুনরায় সে (শাস্তি) ব্যবহার করব। (সুতরাং রসূলুল্লাহ্

(সা)-র আমলে তারা তাঁর বিরোধিতা করলে পুনরায় নিহত, বন্দী ও লাঞ্ছিত হয়েছে। এটা হল ইহকালের শাস্তি এবং (পরকালে) আমি জাহান্নামকে (এমন) কাফিরদের জেলখানা করেই রেখেছি।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ ইতিপূর্বেকার هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ আয়াতে শরীয়তের বিধি-বিধান এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ও সাবধান বাণী উচ্চারণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আয়াতগুলোতে শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বনী-ইসরাঈলের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলে আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। ওরা তাদেরকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। এরপর তারা কিছুটা হুঁশিয়ার হলে এবং অনাচারের অভ্যাস কিছুটা কমে আসলে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু কিছু দিন পর আবার তাদের মধ্যে অনাচার ও কুকর্ম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত করেন। কোরআন পাকে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসে এ ধরনের ছয়টি ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

প্রথম ঘটনা ঃ বর্তমান মসজিদে আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আ)-এর ওফাতের কিছু দিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ এর প্রায় চারশত বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মূর্তি পূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থার যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা ঃ এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধনসম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা ঃ এর কারণ এই যে, উপরোক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী। সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়-তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। এ দুর্ঘটনাটি সোলায়মান (আ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির

মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করে। এ সময় ইহুদীরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনর্নির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা ঃ ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-র জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছু দিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটদের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আ) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনা ঃ হযরত ঈসা (আ)-র সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদীও ছিল না এবং খৃস্টানও ছিল না। কেননা তার অনেক দিন পর কনস্টানটাইন প্রথম খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রা) এটি পুনর্নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তফসীরে বয়ানুল কোরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কোরআনে উল্লিখিত দু'টি ঘটনা কোন্ গুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যত এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদীদের নস্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বোঝা দরকার। বলা বাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হোযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

হযরত হোযায়ফা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে আরয করলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ)-এর জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকূত ও যমরুদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান (আ) যখন এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন,

তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিনদের তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হোযায়ফা বলেন ঃ আমি আরয করলাম, এরপর বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহ্র নাফরমানী করে, গোনাহ্ ও কুকর্মে লিপ্ত হল এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নি উপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল মোকাদ্দাস শাসন করে। কোরআন পাকের فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। বুখতা নছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানারকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মুকাবেলার জন্য তৈরী করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বুখতা নছর যেসব ধনসম্পদ বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ্ সেগুলোও বায়তুল মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসলাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানী কর এবং গোনাহ্র দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আযাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا বলে একথাই বোঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধনসম্পদ রোমের স্বর্ণ মন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ যমানায় হযরত মাহ্দী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন